একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮৫ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬৪। অঞ্জলি—মঙ্গল্য বিভু দেবতা।

১। আমরা যাহা কিছু বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি, সে সমস্তই তোমা হইতেই পাইয়াছি। হে বরেণ্য! হে বিশ্বজগতের মিত্র! তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে কেহই পরাজিত করিতে পারে না।

২। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তুমি আমাদের প্রয়োজন জানিয়া যথাসময়ে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছ। তুমি নিজহস্তে যাহার ভাণ্ডার ধনৈশ্বর্য্যে পূর্ণ করিবে, কাহার সাধ্য যে, সে তাহার বিরুদ্ধে অর্গলরূপে দাঁড়াইতে পারে? তুমি আমাদিগের সহায় হও, যাহাতে আমরা ধনে মানে খ্যাতিতে এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সর্ব্বদাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই।

৩। হে বরেণ্য রাজগণরাজা! আমাদের শত্রুরা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। তুমি আমাদিগকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা কর। আমরা যদি তোমার নিকটে কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে হে দয়াময়! তুমি আমাদের সেই অপরাধ ক্ষমা কর।

৪। হে পিতা! হে মাতা! তোমার নিকটে যাইবার পথ সরল ও সুগম করিয়া রাখিয়াছ, জানি। আমাদিগের পথপ্রদর্শক হইয়া তুমিই আমাদিগকে সেই পথ প্রদর্শন কর, যাহাতে আমরা ভ্রমবশতঃ বিপথে গিয়া কণ্টকে বিক্ষতদেহ না হই। আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি তোমার চরণে নিবেদিত হউক।

৫। হে যজ্ঞপ্রবর্ত্তক! যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তুমি আমাদিগকে প্রবৃত্ত করাইয়াছ, সেই সকল যজ্ঞ তোমারই নামে উৎসর্গ করিয়াছি। তুমি আমাদের সেই সকল যজ্ঞ সার্থক ও সুফলপ্রসূ কর।

৬। হে আদিদেব পরমদেব! তুমি আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমাদের বংশে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান, তোমার কার্য্যে দানশীল অপত্য জন্মগ্রহণ করে। তুমি আমাদের বংশকে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এবং ধনে অর্থে ও সুখসমৃদ্ধিতে চিরসমৃদ্ধ কর।

৭। হে পরম সখা! তুমি আমাদের পরম সুহৃৎ ও পরম বন্ধু। আমাদের প্রতি তোমার দয়ার কথা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি সকলের সম্ভজনীয়। তোমার মহত্ত্বের অন্ত কোথায়—অন্ত কোথায়? তুমিই অমৃত পুরুষ। তুমি ভেলাস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুস্তর মৃত্যুসাগরের পরপারে লইয়া যাও।

৮। আমাদের অন্তর হইতে দ্বেষহিংসা সমূলে উৎপাটিত কর। যে আমার হিতকারী সেও যেমন আমার বন্ধু, যে অহিতকারী সে-ও আমার

তেমনই বন্ধু। হিত কাহাকে বলে? অহিতই বা কাহাকে বলে? তুমি আমাদের একমাত্র মঙ্গল্য দেব। যাহা কিছু তুমি দিবে, সে সমস্তই আমাদের কল্যাণপ্রদ। যাহা কিছু আমাদিগকে তুমি প্রেরণ করিবে, আমরা তাহাই তোমার মঙ্গল দান বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

৯। হে সুখকর কল্যাণকর! আমাদের আত্মাতে অহিংসা মুদ্রিত করিয়া দাও। আমরা যেন কাহারও নিন্দা না করি, কাহারও অমঙ্গল ইচ্ছা না করি, এরূপ ইচ্ছা ও শক্তি আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ কর। আমাদিগকে অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় করিবার ক্ষমতা প্রদান কর।

৬৫। অঞ্জলি—রক্ষক দেবতা।

১। হে পূষণ্! আমরা পথভ্রান্ত পথিকের মত তোমা হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। শতবিধ বাধা-বিঘ্নের কণ্টক আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। আমাদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর। আমাদিগকে পথ প্রদর্শন কর, যাহাতে আমরা তোমার সিংহাসনতলে পৌঁছিয়া বিনাশ হইতে রক্ষা পাই।

২। তুমি রক্ষকদিগেরও রক্ষক। আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি বলিয়া, পাপে নিমগ্ন যাহারা, তাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিবার বিভীষিকা দেখাইতেছে। পাপাচরণে সুখ আছে বলিয়া আমাদিগকে তাহারা কত-না প্রলোভন দেখাইতেছে। তাহাদিগকে তুমি আমাদের সম্মুখে আসিতে দিও না—দূরে সরাইয়া দাও।

৩। আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল। তোমার বিরোধী যাহারা, তাহারা আপাতত আমাদের রক্তশোষণ করিয়া আপনাদিগকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে উদ্যত। তাহারা আমাদিগকে কিছুতেই তোমার পথে যাইতে দিতে চাহে না। প্রতিপদে তাহারা আমাদের পথে অর্গলরূপে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই সকল পাপীদের মুখে মধুবৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের হলাহল সর্ব্বদাই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কুটিল ব্যক্তিকে তুমি আমাদের পথ হইতে অপসারিত করিয়া দাও।

৪। তাহারা আমাদের ধনধান্য লুণ্ঠন করে করুক। কিন্তু তাহারা যে আমাদের মানসিক বলও চুষিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং আমাদিগকে তোমা হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে শুভবুদ্ধি দাও। তাহাদের পাপচিন্তাসকল দলিত ও বিনষ্ট কর, যাহাতে তাহারা আর কাহারও অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত না হয়।

৫। হে পূষণ্! তোমার জ্ঞানভাণ্ডার অক্ষয়। সেই জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দাও, যাহাতে আমরা তোমার প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়া শত্রুদিগকে সংগ্রামে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারি। তুমিই আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, আমাদিগকেও সেইরূপ তুমি সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা কর।

৬। চারিদিকে যত কিছু ঐশ্বর্য্য দেখিতেছি, এ সমস্তই তোমার। তোমারই আদেশে এই পৃথিবীতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত হইয়া আমাদের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতেছে। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাদিগকে ধনধান্য দিয়া দারিদ্র্যমুক্ত কর।

৭। আমরা তোমার পথে চলিতেছি, আর বিপক্ষেরা তাহাতে বাধা দিতেছে। তুমি সেই সকল শত্রুদিগকে অপসারিত কর, যাহাতে আমরা সহজে তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি। তোমার নিকটে পৌঁছিবার জন্য কোন্ পথটী সরল পথ, আমরা তাহা জানি না। তুমি আমাদিগকে সেই সরল পথ দেখাইয়া দাও। আমরা অনেকবার নিজের গর্ব্বে বিপথে গিয়া কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছি। এখন তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর—তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর।

৮। তোমার এই রাজ্য ধনধান্যে পরিপূর্ণ। তথাপি আমরা অন্নজলের অভাবে ডুবিয়া আছি কেন? অনাহারের কষ্টে ঋণের কষ্টে আমাদের গণ্ড বাহিয়া নিরন্তর অশ্রু ঝরিতেছে। তুমি আমাদের সকল দুঃখ সকল কষ্ট দূর করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর—তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। তুমি করুণাময়। তোমার করুণার সীমা নাই। তোমার করুণার কণামাত্র আমাদিগকে

প্রদান কর, আমাদের গৃহ অক্ষয় ধনভাণ্ডার হউক, আমাদের মনপ্রাণ তাপমুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠুক। তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর—তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। আমরা তোমার সন্তান; আমরা তোমারই পরিচালিত সৈন্য। আমাদিগকে আর দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিও না, নিস্তেজ করিয়া রাখিও না। আমাদের প্রচুর অন্ন-জলের ব্যবস্থা কর। আমাদের শৌর্য্যবীর্য্য, আমাদের মনের বল, আত্মার তেজ সমস্তই বর্দ্ধিত হউক। আমরা তোমারই কৃপার ভিখারী। আমাদের সমস্ত স্তবস্তুতি তোমাতেই গিয়া পরিসমাপ্ত। তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর।

৬৩। অঞ্জলি—বরাভয়দ দেবতা।

১। জগতে যাহা কিছু জ্ঞান আছে, সে সমস্তই তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। তুমিই সকল জ্ঞানের মূল উৎস। তুমিই প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া যথাযুক্তরূপে কাম্য বস্তুসকল বিধান করিতেছ। তুমি ভূমা, তুমি মহান। তোমার এক হস্তে ভক্ত সাধুদিগের রক্ষার জন্য তুমি নিত্য বরাভয় ধারণ করিয়া আছ। তোমার অপর হস্তে অশ্রদ্ধাবান অসাধুদিগের দণ্ডবিধানের জন্য তুমি বজ্রদণ্ড ধারণ করিয়া আছ। তোমার রুদ্রমূর্ত্তি তাহাদের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করুক। তুমি আমাদের অন্তরে নিত্য অধিষ্ঠান কর। তোমার নামে আমাদের অন্তরে শত শত সুতান গীতি ঝঙ্কার দিয়া উঠুক।

২। তুমি আমাদিগকে আধিব্যাধি হইতে মুক্ত কর। আমাদের গো-অশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তুকে স্বাস্থ্য প্রদান কর। আমাদের দাস-পরিজনবর্গকে নীরোগ রাখ। আমাদের গাভী সকলকে প্রচুর দুগ্ধবতী কর। আমাদের শিশুসন্তানদিগকে অপত্যগণকে সবল কর।

৩। আমাদের অন্তরে তুমি মৈত্রীভাবকে প্রতিষ্ঠিত কর, যাহাতে আমরা শত্রু-মিত্র দেবমনুষ্য সকলের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারি।

৪। আমাদের সমস্ত স্তবস্তুতি, সমস্ত গান তোমারই নামে উত্থিত হউক। আমাদের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত অনুষ্ঠান তোমারই চরণে নিবেদিত হউক। আমরা যাহা কিছু শুভকর্ম্ম করিব, সে সমস্ত তোমাতেই পরিসমাপ্ত হউক। তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর এবং সুখসম্পদে পরিবৃত কর।

৫। সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি যত কিছু দীপ্তিশীল পদার্থ আছে, তোমারই তেজের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া তাহারা দীপ্তিশীল হইয়াছে। তুমি জ্যোতির জ্যোতি। তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমিই এই বিশ্বজগতের একমাত্র আশ্রয়।

৬। আমরা যেন আমাদের দাসবর্গের প্রতি ক্ষমাশীল হই এবং পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহশীল হই। আমরা যেন আমাদের পালিত সন্তানগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করি। আমাদের গৃহে তুমি সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রেরণ কর।

৭। হে দেবদেব! তুমি আমাদের নিকট তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ কর এবং আমাদিগকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান কর। আমরা যেন ধনধান্যে পরিপুষ্ট হইয়া দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ দেহমন লইয়া সংসারে বিচরণ করিতে পারি।

৮। আমাদের শত্রুরা আমাদের প্রতি হিংসা প্রকাশে উদ্যত। তাহাদের অন্তর হইতে তুমি হিংসার ভাব নির্ম্মূল করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দয়া প্রভৃতি কোমল ভাবসকল নিহিত কর। আমাদিগকে অন্নজল দান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। হে ঈশ্বর! মানুষের হৃদয়েই তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসন। আমাদিগকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? তুমি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও। তোমার জন্য আমরা সেই উজ্জ্বল স্বর্ণ-সিংহাসন পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি সেই সিংহাসনে বসিয়া আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধার পূজা গ্রহণ কর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(বালকের রচনা)

(শ্রীতারকনাথ সেন)

ইংরাজরাজত্বে বাঙ্গালী যে স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, ভারতের অন্য কোন জাতি সে স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মহনীয় চরিত্রই আমাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিয়াছে। যে বিদ্যাসাগর সেবাধর্ম্মের প্রবল বন্যা দেশময় প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, যে বিদ্যাসাগর প্রকৃত ত্যাগের ও তেজস্বিতার এক জ্বলন্ত চিত্র দেশের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাসাগরের চরিত্র কত মহান্, আজকালকার স্বার্থপর সঙ্কীর্ণমনা বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা যে কত বড় আদর্শ তাহা সহজেই অনুমেয়।

এক-একটা জাতির এক-একটা সময় আসে, যে সময়ে তাহার আশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর সেই সময় সেই জাতির মধ্যে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর এইদিন আসিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক মহাপুরুষের উদয় হয়। এই সময় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, পরমহংসদেব, কেশবসেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দপ্রমুখ মনীষীগণের উদয় হইয়া বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়। এই সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুকতারার ন্যায় জ্বল জ্বল করিতেছেন।

দূর দূর পল্লীগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট বিদ্যাসাগরের নাম সুপরিচিত ছিল। লোকে অতি দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিত, তখন বিদ্যাসাগরকে তাহারা স্মরণ করিত। ইহার কারণ কি? বিদ্যাসাগরের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, তাঁহার নিষ্কাম মানবপ্রেমই তাহার একমাত্র কারণ। সেই সময় কতকগুলি তথাকথিত সমাজনেতা সদাচারের নামে অনাচার আনিয়া সমাজটাকে অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছিলেন। একজন কেহ নীচ জাতি হইলে তাহার একেবারে সর্ব্বনাশ! একটা মেথর যদি কলেরায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জল চাহিতে থাকে, সমাজকর্ত্তারা বলেন—"ওহে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না!" হতভাগ্য সমাজের এই অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করে—সমাজকর্ত্তারা এই প্রাণিহত্যা দেখিলেও দয়ার্দ্র হন না, অথচ উপদেশ দেন—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" বিদ্যাসাগর আসিয়া এইটাকে একেবারে ঘুচাইয়া দিলেন। সমাজের পদদলিত এই চণ্ডাল-মেথরকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন। যে বিশ্বসাম্যের ভাব বেদ, গীতা, উপনিষদ হইতে ঝঙ্কৃত হইতেছে, বিদ্যাসাগর সেই সাম্য জগতের চক্ষে তুলিয়া ধরিলেন, মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জগতকে ধন্য করিয়া গেলেন।

কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশেই চরিত্র ফুটিয়া উঠে। চরিত্রের মাধুর্য্য এই স্থানেই। বিদ্যাসাগরের চরিত্র এইরূপেই ফুটিয়াছিল। বিদ্যাসাগর বাহিরে বজ্র অপেক্ষা কঠিন ছিলেন। তাঁহার ভিতরটা কুসুম অপেক্ষাও কোমল ছিল। অন্যায়ের প্রতি বিদ্যাসাগর চিরদিনই রুদ্রমূর্ত্তি, কিন্তু সেই বিদ্যাসাগরই দুঃখের সম্মুখে অভিভূত হইয়া পড়িতেন—নিজেকে হারাইয়া—মগ্ন হইয়া যাইতেন; তখন আর কারণানুসন্ধান, জাতিভেদ কিছুই তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে পারিত না। কাহারও কোন কিছু একটা দুঃখ দেখিলে বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেন। কাহারও মৃত্যুসংবাদ পাইলে বালকের ন্যায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন। তখন জ্ঞানের উপদেশ, বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে পারিত না।

বিদ্যাসাগরের জনহিতৈষণা সমাজ প্রায়ই মঞ্জুর করেন না। শাস্ত্রে বলে, সৎপাত্রে দান করিবে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে দান করিবে ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যাসাগর দুঃখের দ্বারা নিজেকে এমনই হারাইয়া ফেলিতেন যে, পাত্রাপাত্র বিচার করিবার সময় থাকিত না। তখন শাস্ত্রোপদেশ তাঁহার চক্ষে ঠেকিত না। কিসে লোকটার দুঃখ দূর হইবে এই লইয়াই বিদ্যাসাগর ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার গভীর প্রেম এমন ছিল!

নদী যখন পূর্ণবেগে ছুটিয়া যায়, সে তখন কোন বাধাবিঘ্ন মানে না। সম্মুখে যদি উপলখণ্ড পড়ে তাহাও উপড়াইয়া ফেলিয়া চলে। বিদ্যাসাগরের প্রেমনদীও এইরূপ পূর্ণ উদ্দামভাবে চলিত, বাধাবিঘ্ন সমস্ত উপড়াইয়া ফেলিত, লোকাচারাদি তাঁহার নিকট উড়িয়া যাইত। বিদ্যাসাগর নিষ্কাম প্রেমের জ্বলন্ত মূর্ত্তি!

'দয়া' আর 'মায়া'—দুটাই ভালবাসা; কিন্তু 'মায়া' জিনিষ সঙ্কীর্ণ, 'দয়া'—সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা; 'মায়া'—আত্মীয়-স্বজনে ভাল-

বাসা। 'মায়া'র ভিতর স্বার্থপরতা থাকে। যে 'মায়া' লইয়াই থাকিবে সে মরিবে। শাস্ত্রে আছে—

'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥'

যে সকলকে নিজের মত না ভাবিতে পারে সে আবার মানুষ? বিশ্বপ্রেম একটা বড় জিনিষ। সে প্রেম অনন্ত। সে প্রেম অনন্তকে চায়, অনন্ত সেই প্রেমকে চায়! বিদ্যাসাগর এই বিশ্বপ্রেম লইয়াছিলেন; তিনি মায়া ছাঁট দিয়া তাহা লইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের মহত্ব, দেবত্ব এইখানেই। নিষ্কাম প্রেম এই জগতে কয়জন দেখাইতে পারে? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" কেন?—এই নিষ্কাম প্রেমের জন্য। তাঁহারা মূর্ত্ত প্রেম। বিদ্যাসাগরও এই নিষ্কাম প্রেম দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি মহাপুরুষ।

বিদ্যাসাগরের ভিতরে একটা জাতীয়তার ভাব ছিল। সেটাও তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ঐ যে চিরন্তন পোষাক—একখানি চাদর আর চটী জুতা, উহার মধ্য দিয়া একটা পূর্ণ জাতীয় ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখনকার বাঙ্গালীরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভোগবিলাসমুগ্ধ, পাশ্চাত্য বেশভূষার অনুকরণে ব্যস্ত। বিদ্যাসাগরের এই চাদর আর চটী জুতা তাহাদের সম্মুখে পুনর্ব্বার সেই প্রাচ্যের চিত্র তুলিয়া ধরিত। বাস্তবিক, এই চাদর ও চটী জুতার মধ্য হইতে দেশের গৌরব ফুটিয়া উঠিত। পাশ্চাত্য-মোহ-মুগ্ধ মূঢ় বাঙ্গালীকে তাহা স্বদেশপ্রেম বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদান করিত।

বিদ্যাসাগরের অপূর্ব্ব ত্যাগ, তাঁহার বিশ্বপ্রেম, তাঁহার মহত্ব সমগ্র মানবসমাজের আদর্শ। তিনি সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তিনি সাহিত্য ও শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, এগুলি মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলের উপরে তিনি যাহা আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন তাহা নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম। এই প্রেমের বলেই সিদ্ধার্থ মানবদুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ নিবারণার্থে ধন, জন, মান, সংসার—সব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই "নিষ্কাম কর্ম্মের" কথাই কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কবির সেই অমর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে' গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,—
সেই পথ লক্ষ্য করি স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধরি
আমরাও হব বরণীয়।"

ঘাসের ফুল।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

ঘাসের ফুল
দোদুল দুল
আমার মন
করে আকুল।

ওরা কি চায়
এই আমায়?
এতেই ওরা
স্বস্তি পায়?

নইলে কেন
সজ্জা হেন—
আমার মন
দুল্‌, দুলায়?

দুলাও মন
হে সুন্দর
ভুলাও মোর
এ অন্তর।

করি প্রণাম
তোদের পায়—
পৌঁছবে না
তা' দেবতায়?

স্বপন ঘোর
ভাঙ্‌ রে ভাঙ্‌—
প্রেমের ডোর
আন্‌ রে আন্‌।

প্রেম ধরায়
মুক্তি দেয়
মর অমর
হয় ত্বরায়।

তোদের মত
ফুটতে চাই—
সহজ শোভায়
লুটতে চাই

ডুবাও মন
হে সুন্দর—
আমি অসৎ
অসুন্দর ॥

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

(শ্রীতরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

ভারতের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রয়াস পাইয়াছি। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের জন্য ভারত আজ যথেষ্ট করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় ও শতসংখ্যক ত্যাগী মহাপুরুষের আহ্বানে ভারত উদ্বুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যে ভারত আত্মহারা হইয়াছিল সে আজ সজাগ হইয়াছে, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। কিন্তু আমরা জাতিহিসাবে কত বড় হইয়াছি দুই চারিজনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই তাহার সাক্ষী নহে। ভারতের অধিকাংশ লোক আজ কি করিতেছে? আমি জাতিহিসাবে রুশিয়াকে বড় জাতি বলিলাম যখন দেখিলাম যে, রুশিয়ার দশহাজার যুবক নিজের স্বার্থ ও সুখের আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল। আমি শুধু মহর্ষি টলষ্টয়ের কার্য্যাবলি দেখিয়াই রুশিয়াকে বড় জাতি বলিয়া স্বীকার করিব না। আমি দেখিতে চাই, সেই জাতি একযুগে এক যে মহাত্মার বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারা পরে তাঁহাকে কতদূর অনুসরণ করিয়াছে—বিশ্বজনীন ভাব ও স্বদেশপ্রীতি সমগ্র রুষজাতির জীবনে কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে? একথা যেমন রুশিয়ার বিষয়ে বলা চলে ভারত সম্বন্ধেও সেই একই কথা। রুশিয়ার বিখ্যাত লেখকের কয়েকখানি বই পড়িয়া আমার মনে হয়, রুশিয়ার সমস্যা ও ভারতের সমস্যা প্রায় একই। ভারতের মত তাহারও বেশীভাগ লোকই অশিক্ষিত ছিল। কিন্তু আজ সকলের সমবেত চেষ্টায় সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের এক বিরাট আয়োজন চলিতেছে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রুশিয়া সেদিন অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু এই ভীষণ দুঃখদুর্দ্দিনের মধ্যেও তাহারা হতাশ হয় নাই।

ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও সামাজিক উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর বিশেষ প্রয়োজন। আমি রাজনৈতিক অধিকারকে ভারতীয় শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির সঙ্গে বিযুক্ত করিয়া দেখিতে চাই।

যে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আমরা মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সময়ে তাহা যে লাভ হইবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেই কি আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি? বলিতে গেলে উহা আমাদের জাতীয় কর্ম্মসাধনের প্রথম সোপান মাত্র। সেই জাতীয় কর্ম্ম হইতেছে চির ভবিষ্যতে জাতীয় শিক্ষা বিস্তার এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। ইহার সীমা দেখা যায় না। এই কর্ম্মসাধনে আমাদিগকে সোপান হইতে সোপানে ক্রমাগতই উচ্চে উঠিতে হইবে। আমাদের জাতিকে আরও বড়—আরও বড়—আরও বড় করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক লোক—যে যেদিক দিয়া পারে, সেই দিক দিয়াই তাহাকে দেশের কার্য্য করিতে হইবে—কেহ বা রাষ্ট্রনৈতিক, কেহ বা সামাজিক, কেহ বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া। দেশনেতারা সকলেই যে একই মার্গ ধরিয়া দেশের কার্য্য করিবেন, এমন কোন কথা নাই।

ইংরাজ ও আমেরিকান আজ পৃথিবীর মধ্যে বড় জাতি বলিয়া পরিচিত কেন? তাহাদের উন্নতির মূলে জ্ঞানবিস্তার ও সর্ব্ববিধ অভাবমোচনের চেষ্টা। তাহাদের মধ্যে দরিদ্রের প্রতি ক্রোড়পতিদের কি গভীর ভালবাসা! কার্নেগী তাঁহার সমস্ত টাকা গ্রামে গ্রামে এক-একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহামতি ফোর্ড অজস্র টাকা অর্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি হইতে যে কার্য্য উদ্ভূত হইয়াছে তাহা দ্বারা তিনি অসংখ্য নরনারীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়বিধান করিতেছেন। অর্থোপার্জ্জন

যে দেশসেবার জন্য, দেশবাসীর উন্নতিবর্দ্ধনের জন্য, ইহা ভারতবাসী কবে ভাবিবে ? আমাদের দেশেও ধনী রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন। সম্মুখে অনশনে কত পরিবার মরিতেছে, তাঁহারা সে দিকে উদাসীন। কয়েক বৎসর হইল, বাঙ্গলাদেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। গোরক্ষণীর জন্য বরদার মহারাজা ঐ সময়ে দশ লক্ষ টাকা দান করেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের করুণ সংবাদেও অর্থসাহায্য করেন নাই! কতিপয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আসিয়া বলিলেন "স্বামীজি! গোমাতার জন্য আমাদের কিছু অর্থের প্রয়োজন। আপনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সহায়তা করুন"। বিবেকানন্দ বলিলেন—"মানুষ-মাতার সন্তান বাঙ্গালা দেশে নিরশনে মারা যাইতেছে। তাহাদের জন্য আপনারা কি করিতেছেন ?" শুনিয়া তাঁহারা লজ্জিত হইলেন। স্বামীজী একটু বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন "দেখুন, আপনারা বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু করিতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। মানুষ-মাতার সন্তান যাহারা, তাহারা এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে নিরশনে মরণোম্মুখ বঙ্গবাসীকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে।"

আমরা অনেক স্থলে অন্ধ বিশ্বাসকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেই বিশ্বাসের মূলে যখনই কুঠারাঘাত করা হয় তখনই অজস্র লোকনিন্দা ভোগ করিতে হয়। আসামের সীমান্তে ডিব্রুগড় নামে একটি সুন্দর সহর আছে। সেখানে কতিপয় বালককে আমি উদ্বুদ্ধ করিয়া মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করি। তখন আমার বয়স আঠারো বৎসর। এই বয়সে গ্রীষ্মাবকাশে আমি আসামের প্রায় সকল স্থানই পর্য্যটন করিয়াছিলাম। কিন্তু সর্ব্বদাই একটি অনুভূতি হইত—কিরূপে আমি দেশসেবায় নিযুক্ত হইব। সে সময়ে শিলংএ শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সন্ধ্যায় প্রায়ই বেড়াইতাম আর আমার বিবিধ প্রশ্নের উত্তর তিনি হাসিমুখে সর্ব্বদা দিতেন। তাহাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—দেশসেবী কিরূপে হওয়া যায় ? তিনি বলিলেন, 'বড় কাজ না করিলে যে দেশের সেবা করা যায় না তাহা নহে। দেশের সেবা করিতে গেলে জীবনের ছোট ছোট কার্য্যকে অবহেলা করিবে না। প্রতিবাসীকে যেরূপ ভাবে সাহায্য করিতে পার সেইরূপ ভাবেই করিবে। দরিদ্রের কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। ছোট কাজকে কখনও অবহেলা করিবে না। ছোট ছোট শুভ কার্য্য হইতেই তোমার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তখন তুমি বড় কাজ করিতে পারিবে। সেইবার শ্রীমতী এনি বেশান্ত বিশেষ কঙ্গ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। শ্রীমতী বেসান্তকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম যেন তিনি আমাকে দেশসেবী করিয়া লন। শ্রীযুক্ত জি, এস, আরাণ্ডেল তাঁহার হইয়া প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—শ্রীমতী বেশান্ত আপনার পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য ভুলিবেন না—প্রতিবেশীর উপকারে নিরত থাকিবেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পারিবারিক উন্নতি সাধন করিয়াও দেশের সেবা করিতে পারেন। যদি একজন যুবক আদর্শস্থানীয় হয়, পারিপার্শ্বিক অসংখ্য যুবককে সে সৎপথে আনিতে পারে। আমি ডিব্রুগড়ে যে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহা দ্বারাই সেইখানে একটি নৈশ বিদ্যালয় চলিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই আমার প্রাণে একটা গভীর বেদনা আছে—কিসে চা-বাগানে কুলী-দিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয়। প্রায় দুই লক্ষেরও অধিক লোক আসামে পশুর ন্যায় অশিক্ষিত অবস্থায় আছে। তাহাদের শিক্ষার বিশেষ কোন আয়োজন নাই। উহাদের মধ্যে শিক্ষার যে আগ্রহ কত, তাহা আমি একটি ঘটনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কলেজের কয়েক জন ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমি একটি চা-বাগানের কুলীর আড্ডাতে উপস্থিত হই। সর্দ্দারকে বলিলাম, সকলকে ডাক, তোমাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের কাছে এক জন কুলি তাহার কন্যাকে আনিয়া বলিল—বাবা আমার এই মেয়েটিকে পড়াও—আমার একটিমাত্র মেয়ে। কেহ বা আসিয়া বলিল—আমার ছেলেকে পড়াও। তাহা-

দের আগ্রহ দেখিয়া আকৃষ্ট হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম ; দেশের ডাক আসিয়াছে। কেহ আর পিছনে পড়িয়া থাকিতে চায় না।

ভারতে প্রায় ২০ হাজার দেবালয় আছে। তাহাদের অধিকাংশেরই যথেষ্ট আয় আছে, কিন্তু অনেকস্থলেই চরিত্রহীন পূজারি বা মোহান্তের হস্তে পরিচালন ভার। উহার আমূল সংস্কার সাধিত হইলে প্রত্যেক দেবালয়ে এক-একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ; এইরূপে সমগ্র ভারতে ২০ হাজার স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। অভিনব প্রণালীতে 'সহযোগী ব্যবস্থার' বা co-operative movement এরই বিশেষ প্রয়োজন। আপনারা জানেন যে 'সহযোগী ব্যবস্থা' প্রথমতঃ জর্ম্মাণীতে প্রচলিত হয়। এই জর্ম্মাণীর অনুসরণ করিয়াই পৃথিবীময় সহযোগী ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই সহযোগী ব্যবস্থা হইতে আমাদের সামাজিক ও শিক্ষা কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে।

প্রতি পরিবারে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে ; তাহার ফলে সমাজের মধ্যে সদ্ভাব, ধর্ম্মভাব পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকেরা যাহা উপার্জ্জন করে তাহার কিয়দংশ তাহাদের গ্রামেই প্রতিস্থাপিত সহযোগী ব্যাঙ্কে যদি দেন তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কার্য্য সুচারুভাবে চলিবে। এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইতে পারে এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি, বস্ত্রবয়ন, ছুতারের ও কামারের কার্য্যের শিক্ষা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে চারিদিকে একটা হাহাকার আর্ত্তনাদ চলিতেছে। তাঁহারা চাকরীর অনুসন্ধানে কতই না সাধ্যসাধনা করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নিষ্কর্ম্মার সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহাদের এমন কোন শিক্ষা হয় নাই যাহা দ্বারা তাঁহারা স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। সেদিন কলিকাতার মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কর্পোরেশনের চাকুরে লোকদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা যদি বল কর্পোরেশনের চাকরী ছাড়িয়া দিলে তোমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইবে, তাহা হইলে আমি বলিব, তোমরা বৃথাই জীবন নষ্ট করিয়াছ।" আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগকেও এই একই কথা বলা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধি লইয়া তাঁহারা যখন মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনের চাকরি গ্রহণ করিতে ছুটাছুটি করেন, তখন বলিতে হয় যে, তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। আমাদের সমাজই এই শত-সহস্র যুবককে এত অপদার্থ করিয়াছে। ভারতে শিক্ষিত কৃষকের বিশেষ দরকার। সুশিক্ষিত কৃষকের দ্বারা ভারতের যুগান্তর আসিতে পারে। শিক্ষিত যুবকেরা কৃষিকর্ম্মে নামিলে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে নব নব পন্থা বাহির করিবেন এবং তাহার সুফল দেখিয়া অশিক্ষিত কৃষকেরাও তাহার অনুসরণ করিবে। ভারতের কৃষকেরা হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে লাঙ্গল দিয়া জমি চষিত আজও সেই লাঙ্গলই ব্যবহার করিতেছে—উন্নত প্রণালী আনিবার কোন চেষ্টা নাই। বৈজ্ঞানিক কৃষিবিজ্ঞান এদেশে বিস্তারিত হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকায় জমির উৎপাদনী শক্তি বহুগুণ বির্বর্দ্ধিত হইয়াছে, কৃষিক্ষেত্রের প্রসার ও আবাদী জমির পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ প্রচলিত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞদিগকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়া কৃষকদিগকে নূতন নূতন কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। বাষ্পীয় যন্ত্রযোগে চাষ চলিতেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা আছে বলিয়াই আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে দুঃখদারিদ্র্য বলিয়া কিছু নাই। নিজের দেশের যথেষ্ট খাদ্যের যোগাড় রাখিয়াও আমেরিকা বিভিন্ন দেশে খাদ্যদ্রব্যাদি যথেষ্ট রপ্তানি করিতেছেন। হায়, ভারতে সে শুভদিন কবে আসিবে !

উড়িষ্যার কথা।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্বকথা।

পূর্ব্বে, অতি পূর্ব্বে উড়িষ্যা বলিয়া কোন দেশ ছিল না ; এই নদী ও অরণ্যসঙ্কুল ভূখণ্ডে নানা অনার্য্য জাতি বসবাস করিত। আজিও তাহাদের বংশধরগণ, কোল,

গন্দ, কন্ধ, শবর, ভূঞা, পতুয়া নামে পরিচিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে বাউরি, সহর, পাণ, হাড়ি, চামার, ডোম, চিড়িয়ামার, সিয়ল (যাহারা তাড়ি প্রস্তুত করে), গোখা, শিউলা, তিয়র, মুলিয়া (এই চারিটী জাতি মৎস্য-ব্যবসায়ী), পাটরা ও কণ্ডরা প্রভৃতি অনার্য্য জাতি আর্য্য ধর্ম্মে ও সমাজে আশ্রয় লইয়া অপাংক্তেয় ও অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি উড়িষ্যা বা ওড়িশা শব্দ 'ওড়' নামক অনার্য্য জাতির নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিশাল ভূখণ্ডে অনার্য্যদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আর্য্য-উপনিবেশ কোন্ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে,বহুকাল ধরিয়া এইখানে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে সংগ্রাম চলিয়াছিল—অনার্য্যগণ সহজে তাহাদের আবাস-ভূমি আর্য্যগণকে ছাড়িয়া দেয় নাই। হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘকায় অনার্য্যগণ পর্ব্বত ও অরণ্যে যেরূপে আত্মরক্ষা করিতে জানিত ও পারিত, আর্য্যগণ সেরূপ জানিতেন না বা পারিতেন না। তাই অতি সহজে অনার্য্যগণ আর্য্যগণের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। উড়িষ্যার অভ্যন্তরে শৈল ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে আজিও আর্য্যভাব ও আর্য্য-সভ্যতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। অনার্য্যগণ যে সর্ব্বদাই আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত এরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। অনেক সময়ে তাহারা ব্যক্তি বা বংশবিশেষকে কল্যাণকর বন্ধুর মত আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ করিয়া এদেশে ডাকিয়া আনিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে উড়ি-ষ্যার মিত্ররাজ্যসমূহে যে সকল রাজবংশ দেখা যায়, তাহা-দের আদিপুরুষগণ মিত্রভাবেই এই সকল রাজ্যে আসি-য়াছিলেন। অনার্য্যগণ সবল, সুস্থকায় ও সরল বিশ্বাসী; আজিও তাহারা বিশ্বাসঘাতকতাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। গড়জাতের রাজাদিগের পূর্ব্ববংশধরগণ মিত্রভাবে আসিয়া অনার্য্যদিগের রাজা হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ-পুতনায় ভীলগণ যেরূপ রাজপুতের রক্ষক, মিত্র ও বন্ধু-স্বরূপ হইয়া বিপদের সময় রাজপুতের জন্য প্রাণপাত করিয়াছে, সেইরূপ এদেশেও অনার্য্যগণ আর্য্য-ঔপনিবে-শিকদিগের জন্য যৎপরোনাস্তি শ্রম ও ক্লেশ করিতে ত্রুটী করে নাই।

অনার্য্যগণ কোন দিন বলহীন ছিল না, সত্য; কিন্তু শাসন ও সমাজপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে তাহারা কোনও দিন কৃতকার্য্য হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণেই তাহাদিগকে আর্য্যদিগের নিকট পরাভব ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেকালে রাজপুতানা প্রভৃতি দেশ হইতে এক-একজন সাহসী বীর তরবারি মাত্র সম্বল করিয়া উড়িষ্যায় আসিতেন। কোন অনার্য্য সর্দ্দারের নিকট গিয়া তুরী-ভেরী বাজাইয়া তাহাকে দ্বৈরথ বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেন। সর্দ্দারকে পরাজিত বা হত্যা করিলে সেই দেশ জয় করিতে তাঁহাকে আর কোনও বেগ পাইতে হইত না। অনার্য্যগণ তাহাদের সর্দ্দারদিগকে অমানুষিক ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাহাদের পরাভবে তাহারা একেবারে দমিয়া যাইত, এবং সহজেই বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করিত। একটী প্রবাদের উল্লেখ করিব। কেঁদুঝর বা কেঁউঝর রাজ্যের আদি রাজা একজন এইরূপ অসমসাহসিক বীর ছিলেন। তিনি তরবারি হস্তে ভাগ্য পরীক্ষা করিবার আশায় অরণ্যসঙ্কুল মালভূমি অতিক্রম করিতেছিলেন। বহুদূর অতিক্রম করিবার পর তিনি পথ-শ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া এক কেন্দুবৃক্ষের ছায়ায় শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। সেই কেন্দু বৃক্ষের নিকটেই একটি ঝর অর্থাৎ ঝরণা ছিল। যে দেশ দিয়া তিনি যাইতেছিলেন, সে দেশে ভূঞা, জুয়োং ও পাতুয়া-দিগের বাস। তাহারা পত্রগুচ্ছ পরিধান করিত এবং অতি দীন ভাবে জীবনযাপন করিত। পূর্ব্বরাত্রে সেই কেন্দু বৃক্ষের তলায় এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। রাজপুত-বীর তাহার কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না। একপাল শৃগাল বা বন্য কুকুর ছলে বলে কৌশলে এক শার্দ্দূলকে হত্যা করিয়া সেই স্থানে ভক্ষণ করিয়াছিল। এই অঘটন ঘটনায় অনার্য্যগণ বিশেষ বিচলিত হইয়া-ছিল। আজ মধ্যাহ্নে সেই স্থানে গৌরকান্তি উজ্জ্বলমুখ বীরবেশধারী এক রাজপুতসন্তানকে শয়ান দেখিয়া অনার্য্যগণ মনে করিল, স্বয়ং বিধাতা তাঁহাকে তাহাদের শাসক করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা দলে দলে সেই স্থানে আসিয়া রাজপুত-বীরের বশ্যতা স্বীকার করিল। আজিও কেঁউঝর রাজার অভিষেকের সময় ভূঞাগণ দলে দলে অভিষেক উৎসবে যোগদান করে। তাহাদের প্রধান সর্দ্দার রাজপুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া তাঁহার মস্তকে রক্তের রাজটিকা পরাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম মাত্র।

আর এক রাজ্যে ভীষণ ব্যাঘ্রভীতি হইয়াছিল। অনার্য্যগণ সমবেত হইয়া এক রাজপুতবীরকে ব্যাঘ্র বধ করিতে আহ্বান করিল। তিনি ব্যাঘ্র বধ করিয়া দেশের রাজা হইলেন। আজিও তাঁহার বংশধরগণ সেই দেশের সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এক কথায় অনার্য্যগণ সমবেত চেষ্টায় কোন দিন উড়িষ্যার আর্য্য-ঔপনিবেশিকগণের মূলোচ্ছেদ করিতে যত্ন করে নাই। এইরূপ করিলে কেহই আর্য্যগণকে রক্ষা করিতে পারিত না। আর্য্যগণ গভীর জঙ্গলের প্রান্তদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কুটীরনিচয় ও

গবাদি গৃহপালিত পশুসমূহ দেখিয়া অনার্য্যগণ দুই-চার বার তাঁহাদের গ্রাম লুট করিয়া লইল। কিন্তু বৈরভাব পোষণ করিয়া নবস্থাপিত উপনিবেশের ধ্বংস সাধন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের কোন দিন ছিল না। বিশাল অরণ্যের প্রান্তদেশে একটী গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে কতকগুলি কৃষকের কুটীর শোভা পাইতেছে। গরু ও মেষের পাল সেই গ্রামের বাহিরে জঙ্গলে চরিয়া বেড়াইতেছে। অনার্য্যগণের তাহাতে ক্ষতি কি? অপার জঙ্গলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাহারা স্বচ্ছন্দে গতায়াত করিত, জঙ্গলজাত ফলমূল শাকশব্জী, পশু-পক্ষী যাহাদের আহার, এক স্থানে গ্রাম বাঁধিয়া থাকা যাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কৃষি ও গো-পালনে অনভ্যস্ত সেই অনার্য্য জাতিগণের পক্ষে আর্য্য-উপনিবেশ একটী প্রহেলিকা ও রহস্যময় ব্যাপার মাত্র। হৃদয়ে বৈরভাব পোষণপূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া তাহারা কেন সেই গ্রামের ধ্বংসসাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইবে? নবাগতগণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও রণকৌশল জানিতেন। অনার্য্যগণের তুলনায় তাঁহারা শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন। এইরূপ আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের মূলোচ্ছেদ করা সহজ নয় এবং করিয়াও সে সময় অনার্য্যদিগের বিশেষ লাভ ছিল না। এই সকল কারণে উড়িষ্যার আর্য্য উপনিবেশিকগণ গ্রামের পর গ্রাম স্থাপন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গতিরোধ করা অনার্য্যগণ কোন দিন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করে নাই। অথবা মনে করিলেও সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত্নবান হয় নাই। সাধারণতঃ আর্য্য-ঔপনিবেশিকগণ এই ধারা অবলম্বন করিয়া গ্রাম ও রাজ্য স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; নিতান্ত বাধ্য না হইলে তাঁহারাও কোনও দিন অনার্য্যদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। প্রকৃতিদেবী জঙ্গল ও পর্ব্বতসঙ্কুল উড়িষ্যা প্রদেশকে অনার্য্যদিগের বাসভূমির সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় নগণ্য আর্য্যগণ কি প্রকারে সেই অসংখ্য অনার্য্যকুল নির্ম্মূল করিতে পারেন? আর্য্য উপনিবেশস্থাপনের কিছুকাল পরেই ধর্ম্মে ও উপাসনায় আর্য্য ও অনার্য্যের ভাব বিনিময় হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ পুরী, ভুবনেশ্বর, যাজপুর ও ঢেঙ্কানালের অন্তর্গত কপিলাস তীর্থে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনার্য্যগণ আজিও প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। যে সকল বনদেবতার তাহারা পূজা করে, তাঁহারা সকলেই রক্তপিপাসু—বলিদান গ্রহণে পরিতুষ্ট হন। ছাগ, মেষ, মহিষ, বন্য কুক্কুট ও বরাহ এই সকল প্রাণী দেব-দেবীর নিকট বলি দেওয়া হয়। আদিম মানবগণ রুদ্রভাবের একান্ত পক্ষপাতী। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধীরতা বা মাধুর্য্য আদিম মানবকুলকে কোনদিন দ্রবীভূত করিতে পারে নাই; তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সর্ব্বদাই কঠোরতা ও নির্ম্মমতায় গঠিত। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীতেও কোমলতা বা করুণার লেশ মাত্র নাই। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য ও পর্ব্বতকন্দরে অজগর সর্পের বাস। বিষাক্ত ফল-মূল খাইয়া নিত্যই মরণের সম্ভাবনা। বাহিরে বা গৃহপ্রাঙ্গণে দৌর্ব্বল্যের স্থান নাই। প্রত্যেক বালক ও স্ত্রীলোককে তীর-ধনু হস্তে শিকারে যাইতে হইবে কিংবা কুঠার গ্রহণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইবে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠিলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে—কাহারও পরিত্রাণ নাই। শান্তিপ্রিয় বঙ্গ অনার্য্য জাতির যুদ্ধবিগ্রহ অতি কঠোর ও নির্ম্মম, তাহাতে করুণার লেশগন্ধ নাই। বন্দীগ্রহণ বা বন্দীবিনিময়ের কুপ্রথা তাহাদের মধ্যে নাই। আছে অনন্ত রক্তপিপাসা, নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড ও নিদারুণ প্রতিহিংসা। এই জাতি নিজেকে ভুলিয়া, পারিপার্শ্বিক প্রভাব অতিক্রম করিয়া কিরূপে করুণায় মুগ্ধ বা আর্দ্র হইবে? ভক্তিমার্গের সাধনা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান মন্ত্র-তন্ত্র অনার্য্যগণের ছিল না। দর্শন—মায়াবাদ, কর্ম্মবাদ বা অদৃষ্টবাদের ব্যাধি—কোনও দিন উড়িষ্যার বর্ব্বর অনার্য্যদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহাদের দেব-দেবীগণ একান্ত রক্তলোলুপ, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং উৎকোচ ও উপঢৌকন গ্রহণে তৎপর।

আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে উড়িষ্যাদেশে যে কোনদিন উৎকট সংঘর্ষ হয় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উৎকলের প্রধান তীর্থস্থানসমূহে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভুবনেশ্বর উৎকলের শৈবক্ষেত্র। পরবর্ত্তী যুগে উৎকলের হিন্দু রাজগণ ভুবনেশ্বরের বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের তক্ষণশিল্প এত সুন্দর যে আজিও তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে এক সময়ে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার শৈবমন্দির বিদ্যমান ছিল। হিন্দুরাজগণ তাঁহাদিগের কোষাগার শূন্য করিয়া এই সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা কোন দিন কার্পণ্য করেন নাই। তাহা যদি করিতেন, তাহা হইলে, এই মন্দির উৎকলের শিল্পকলার চরম গৌরব-স্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিয়া আজিও লোকের বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করিতে পারিত না। সেই সকল ভূপতি বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন; কনোজ বা বঙ্গদেশ হইতে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে বৃত্তি

দান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভুবনেশ্বরের প্রধান সেবকগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত! তাহাদিগের নাম বড়ু। তাহারাই ভুবনেশ্বরের প্রধান ও পুরাতন সেবক। পূজারি পণ্ডা অর্থাৎ যাহারা বৈদিক মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বর মহাদেবের পূজা করেন, তাঁহারা আজ প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরে আসেন। বড়ুগণ কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনেন, এবং যজমানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার অংশ তাহাদিগকে দিতে স্বীকার করেন। বড়ুগণের আদিপুরুষ অনার্য্য শবর হইলেও বর্ত্তমান বড়ুগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন ; এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, কিন্তু চাষা ও ওড়দিগের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহারা বলেন যে, কন্যাকে 'গোপাল' মন্ত্র দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইলে তাহার জন্মগত দোষ দূর হয়। ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রে গোপাল-মন্ত্রেই শিবের উপাসনা হইয়া থাকে। একাম্র পুরাণ অতি প্রাচীন না হইলেও একটী উপ-পুরাণের মধ্যে গণ্য হয়। এই পুরাণে বড়ুদিগের বিবরণ এইরূপ লেখা আছে—

পূর্ব্বকালে সিদ্ধভূতি নামক একজন লোক জননায়ক ছিলেন। তিনি দেশভ্রমণে বাহির হইয়া একাম্র-ক্ষেত্রে বা ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন। তথায় চন্দ্র-সূর্য্যকে শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন ; কারণ, শিবের প্রসাদ অগ্রাহ্য এইরূপ স্মৃতিতে উল্লেখ আছে এবং ইহা দেশাচারসম্মতও বটে। পরে কৈলাসশিখরে এই বিষয় দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভুবনেশ্বরে শিব বিষ্ণুর সহিত অভিন্নহৃদয় হইয়া অবস্থান করিতেছেন বলিয়াই শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। সিদ্ধভূতি এই কথায় আশ্বস্ত হইলে, শিব তাঁহার হাতে ব্রহ্মার নিকট তাঁহার প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল অবাধে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধভূতি পুনরায় কৈলাসে আগমন করিলেন এবং ভেদবুদ্ধিবশতঃ শিব-দুর্গার সম্মিলিত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। ইহাতে পার্ব্বতীর শাপে সিদ্ধভূতি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-সর্প হইলেন। কিছুদিন পরে এক ময়ূর সেই কৃষ্ণসর্পকে ভক্ষণ করিল। এবং এক ব্যাধ সেই ময়ূরকে বাণ দ্বারা বধ করিয়া তাহার নিদ্রিত পত্নীর নিকট রাখিল। সিদ্ধভূতিরূপ কৃষ্ণসর্প মৃত ময়ূর হইতে নির্গত হইয়া ব্যাধপত্নীর নাসারন্ধ্র দিয়া তাহার দেহে প্রবেশ করিল। যথা সময়ে সিদ্ধভূতি ব্যাধের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। কৈশোর ও যৌবনে তাহাকে শবরবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। এইরূপে উৎকট পাপের ভোগ শেষ হইয়া আসিলেই তাঁহার পূর্ব্ব সুকৃতি প্রবল হইল। সেই সুকৃতি-বলে একাম্রস্তোত্রে লিঙ্গরাজের আরাধনা করিয়া সিদ্ধভূতি শাপ-মুক্ত হইলেন। আশুতোষের অনুকম্পায় সিদ্ধভূতি এই বরলাভ করিলেন যে, কলিযুগে তাঁহার বংশধরগণ শিবপূজা করিতে পারিবেন। বড়ুরা তাঁহারই বংশধর। উড়িষ্যায় মহাদেব ও শক্তির দুই প্রকার সেবক আছে। পূজারি পণ্ডা বা যাঁহারা মন্ত্রপাঠ করেন তাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আর এক প্রকার সেবক আছেন, যাঁহারা ঠাকুরের স্নান ও পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন ও স্থানে স্থানে ভোগ প্রস্তুত করেন। উড়িষ্যার অনেক স্থানে এই প্রকার সেবক অনার্য্যবংশসম্ভূত। ইহাদিগকে ভোগপাণ্ডা বলে। যাজপুরে বিরজা দেবীর সেবকগণ 'ভোপা'জাতি এবং অন্যান্য নানা স্থানে "মালী" নামে অনার্য্য-জাতীয় লোকেরাই মহাদেব ও দেবীর সাধারণ সেবক হইয়া থাকেন। ঢেঙ্কানালের অন্তর্গত 'কপিলাস' পর্ব্বতশিখরে 'কপিলাস' মহাদেব অতি বিখ্যাত দেবতা। এখানে শিবরাত্রির দিন মহাদেবের দর্শনের জন্য বহুলোকের সমাগম হয়, এবং একটী মেলা বসে। কপিলাস মহাদেবের ভোগপাণ্ডাদিগকে চিন্তাপত্রী বলে। তাহারা অনার্য্য শবর-বংশীয়। মহাদেবের সেবায় বহুকাল নিযুক্ত থাকায় তাহারা সাধারণ শবরগণের অপেক্ষা উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে সহজেই অনার্য্য-বংশীয় বলিয়া ধরা যায়। কপিলাসে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে কোন 'পূজাপণ্ডা' ছিল না। 'চিন্তাপত্রীগণই' পূজাপণ্ডা ও ভোগপণ্ডার কার্য্য করিত। এখন কিন্তু দেউলের কার্য্য বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং পূজাপণ্ডাগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাদেবপূজা করেন। আর্য্য ও অনার্য্যের উপাসনামিশ্রণের এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের অন্য স্থানে বিরল। উপাসনাক্ষেত্রে প্রত্যেক হিন্দুরই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। বোধ হয় প্রথম ঔপনিবেশিকগণ লোকাচার ও দেশাচারের বাধা যথেষ্ট থাকিলেও অনার্য্য দেব-দেবীর পূজা মানিয়া লইয়াছিলেন এবং ইহা সঙ্গতই হইয়াছিল, কারণ প্রকৃত পূজা জাতিনির্ব্বিশেষে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সঙ্গত।

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে

বিগত ২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা ১॥০ ঘটিকার সময় সার সুরেন্দ্রনাথের অমর আত্মা দেহাবরণ ভেদ করিয়া অমরলোকে যাত্রা করিয়াছে। একে একে শ্রদ্ধের

আশুতোষ চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ এখানকার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এদেশের পরিচয় দান করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ বড় রহিলেন না। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শেষ সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন, তিনিও আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। যেরূপ ত্বরিত গতিতে ইঁহাদের তিরোধান ঘটিল, তাহাতে সত্যসত্যই মনে হয় যে, আমরা অভিশপ্ত দেশে বাস করিতেছি। আমরা দিন দিন দরিদ্র ও অভিভাবকহীন হইতে চলিলাম। জানি না, ভগবানের মঙ্গলবিধান ভবিষ্যতে কোন্ পথ ধরিয়া দেশের কল্যাণবিধান করিবে।

খ্যাতনামা দুর্গাচরণ ডাক্তারের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ, বিহারিলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত এই তিন জন শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে সিবিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে গমন করেন এবং তিন জনই কৃতকার্য্য হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া ফিরিয়া আসেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আপনার প্রতিভার চিহ্ন কেবলমাত্র রাজসেবায় নহে, সাহিত্যের ভিতরেও যথেষ্ট পরিমাণে রাখিয়া গিয়াছেন। বিহারিলাল গুপ্ত সম্মানের সহিত বিচারবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। বিধিলিপিবশে সামান্য কারণে অচিরেই সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। সে সময় শাসনকর্ত্তাগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সমগ্র অনুরাগ দেশের উপরেই পড়িয়াছিল। তাই আমরা সেই অমিততেজা পুরুষকে ভারতের রাজনৈতিকবিভাগের পিতারূপে লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। বিচারকার্য্যে অন্তর্নিবিষ্ট থাকিলে তাঁহাকে আমরা এভাবে লাভ করিতে পারিতাম না, অপামরসাধারণের দৃষ্টি রাজনৈতিক ব্যাপারে এভাবে খুলিত না। মনে পড়ে সে দিন, যখন তাঁহার দুরদৃষ্টে মর্ম্মাহত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সুকিয়াষ্ট্রীটস্থ মেট্রোপলিটন কালেজে তাঁহাকে অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করেন। অচিরে অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার নাম চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল। যখন রাজনীতি বা শাসনপ্রণালীর কূটমর্ম্ম বড় কেহ বুঝিতেন না, কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেও কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারও হইত না, সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের নির্ভীক বাণী চারিদিকে চমকের সৃষ্টি করিল। দেশময় জাগরণ আসিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা সভাসমিতি ও টাউনহলের চারিভিত প্রকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল। দলে দলে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ তাঁহার পার্শ্বচর হইয়া দাঁড়াইল। সে সময়ের সে উদ্দীপনা, ঐ মূল উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া নানা মুখে সমগ্র ভারতকে জাগ্রত করিতে আরম্ভ করিল। তদানিন্তন ভাইসরয় লর্ড লিটন কোন কোন বিষয়ে আমাদের অধিকার খর্ব্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিবাদবাণী তীব্র হইতে সুতীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হইল; স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু উহাতে মিলিত হইলেন। মহামতি রিপণ শাসনকর্ত্তা হইয়া যখন এদেশে আসিলেন, তিনি তাঁহার দূরদৃষ্টি প্রভাবে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে এদেশীয়গণকে কথঞ্চিৎ অধিকার প্রদান করিলেন। মহামতি ইলবার্ট বিচারবিভাগে শ্বেত-কৃষ্ণ উভয়কে তুল্যভাবে অধিকার দিয়া বিল লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইলে এদেশের ইংরাজগণ উহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অন্য দিকে সুরেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় বিপুল বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। আত্মবোধ জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কংগ্রেসের সূত্রপাত হইল। ভারতের বিভিন্ন অংশের মনীষীগণ কংগ্রেসের ভার গ্রহণ করিয়া উহার পতাকার নিম্নে দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলেন। পরস্পরের ভাবের আকাঙ্ক্ষার আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। মহামতি হিউম সত্যের ও ন্যায়ের অনুরোধে উহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আত্মবোধের ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ভারতের নানা স্থানে পর্য্যায়ক্রমে কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতে লাগিল। ক্রমে মহারাষ্ট্রনেতা বীর্য্যবান তিলক, শান্তপ্রকৃতি অগাধপাণ্ডিত্য গোখলে, দাদাভাই নারোজী—কত অসংখ্য নেতা ও ব্যক্তি উহার সহিত মিলিত হইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রদ্ধেয় জানকীনাথ ঘোষাল আপনার সমগ্র শক্তি দিয়া কংগ্রেসের আয়োজন উপলক্ষে দেশ-বিদেশে প্রতিবৎসর ছুটিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে দেশময় যে জাগরণের ভাব চারিদিকে বিকশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মূল প্রস্রবণ সুরেন্দ্রনাথ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেবল ভারতে নয় কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়া আন্দোলন চালাইতে না পারিলে বিলাতের সহানুভূতি আকর্ষণ করা অসম্ভব ইহা বুঝিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন বিলাতে গিয়া নগরে নগরে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তিনি সেখানে গিয়া যে বাগ্মীতার পরিচয় দান করেন, তাহা সত্য-সত্যই অনন্যসাধারণ। ক্লার্কেনওয়েল (Clerkenwell) নামক স্থানে তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভার যে পরিচয় দেন, তৎশ্রবণে একজন শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার ভিতরে উইলিয়ম পিটের বজ্র-নির্ঘোষ, ফক্সের সুযুক্তি, বার্কের ভাষাকৌশল এবং সেরিডেনের মৌলিকতা পূর্ণরূপে বিরাজিত। একজন

বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজিভাষায় ব্যুৎপত্তির ঈদৃশ সুখ্যাতি আমাদের বক্ষকে সত্য সত্যই বিস্ফারিত করিয়া তোলে। তাহার পর দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গদেশকে পুনর্মিলিত করিবার জন্য তিনি যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেন তাহা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, সুরেন্দ্রনাথ তিনবার কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বরিত হইয়াছিলেন। এ সৌভাগ্য অপর কাহারও অদৃষ্টে নাই।

এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশে মধ্যবিন্দু হইয়া সংগ্রাম করিতে করিতে আমাদের আশা ও অধিকারকে নূতনমূর্ত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি না থাকিলে ভারত এ ভাবে এত শীঘ্র জাগিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আজ কয় বৎসর ধরিয়া চরমপন্থীগণ অত্যুগ্র গতিতে আরও অগ্রসর হইবার জন্য সমধিক চঞ্চল হইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের সঙ্গে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। এই কারণে মতভেদজনিত পার্থক্য দাঁড়াইয়া গেল। চিরকর্ম্মশীল সুরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। বেঙ্গলী পত্র সম্পাদনে ও বাঙ্গালার শাসনবিভাগের মন্ত্রীরূপে কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বেসরকারী বাঙ্গালীর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদ লাভ সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টার অন্যতম ফল। দীর্ঘজীবী সুরেন্দ্র নাথ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে জানিতেন। ইহা তাঁহার স্বভাবের আর একটি দিক্। শেষ জীবনে ইউরোপীয়গণের সগৌরব সৌহৃদ্য লাভ তাঁহাকে গবর্ণমেন্টের চক্ষে খুব সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বাগ্মীতা এক সময়ে লর্ড কর্জ্জনেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। টাউনহল সভায় তাহার জীবন্ত পরিচয় পাইয়াছি। এক সময়ে সংবাদপত্রে তীব্র মন্তব্য লিখনের জন্য তাঁহাকেও কারাবাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। হায়! মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও লোকমান্য তিলক যাঁহারা দেশের সুসন্তান, তৎব্যতীত আরও কত মহাত্মা কারাবাসের গৌরব বরণ করিয়া কেহ বা চলিয়া গেলেন, কেহ বা এখনও কার্য্য করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ আজ নাই; তাঁহার অভাবে সত্য সত্যই এদেশ আরও দরিদ্র হইয়া উঠিল। তাই ভারত জুড়িয়া ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। তাঁহার বিপক্ষবাদীগণের ভিতর হইতেও তুল্য ভাবে বিষাদের ঘন নিশ্বাস বাহির হইতেছে। আমরা আর কি বলিব? তাঁহার চিরকর্ম্মশীল জীবন জগতে একদিনের জন্যও বিশ্রামলাভের অবসর পায় নাই। ভগবৎচরণে আজ তাহা চিরশান্তি লাভ করুক।

শকুন্তলা (পঞ্চমাঙ্ক)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

রাজার এই সকল উক্তি গৌতমীর প্রাণে বড়ই লাগিতেছে। তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না অথচ চঞ্চলও হইতেছেন না। অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে, তাহা দমন করিতেছেন—ব্যাকুল হইতেছেন না, সীমা অতিক্রম করিতেছেন না। তিনি ধীরা প্রবীণা। রাজার এই কূট রাজনৈতিক বাক্যগুলি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অতি মধুর স্বরে ও দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেনঃ—"মহাভাগ! এরূপ কল্পনা করিবেন না। শকুন্তলা তপোবনে লালিতা হইয়াছে—ছল-চাতুরী কিছুই জানে না।"

রাজার মন ইহাতেও ভিজিল না। তিনি গৌতমীকে অনভিজ্ঞা মনে করিলেন। গৌতমীর হৃদয় সরল। তাই তিনি সরল চক্ষে সকলকে দেখেন। সংসারে কত প্রকারের চাতুরী আছে, প্রাচীনেরা তাহার খবর রাখেন না; নবীনেরা অনেক সময়ে প্রাচীনদিগকে তাঁহাদের সরলতার সুবিধা লইয়া বঞ্চনা করিয়া থাকে। তৎকালে রাজার মনে এই সকল কূট নীতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সসম্মানে গৌতমীকে বলিলেনঃ—

"তাপসবৃদ্ধে! কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়াও যে স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ চাতুরীনিপুণা, তাহার নিদর্শন ইতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—মনুষ্য ত দূরের কথা! দেখুন, কোকিলা তাহার শাবকটি যতদিন না উড়িতে শিখে ততদিন তাহাকে অন্য পক্ষী (কাক) দ্বারা প্রতিপালন করায়।"

শকুন্তলা এবারে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এতক্ষণ তিনি রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই। রাজার ভুল হইয়াছে। ভুল হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। ভুলবশতঃ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, ইহা শকুন্তলার পক্ষে কষ্টকর হইলেও রাজার তাহা অন্যায় কার্য্য নহে। কিন্তু শকুন্তলার চরিত্রের উপর সন্দেহ করা, বিশেষতঃ গুরুজনের সমক্ষে তাঁহাকে প্রকারান্তরে দুশ্চারিণী বলা নিতান্তই

অসহনীয়। রাজার ইহা সত্যই অন্যায়াচরণ। শকুন্তলা ইহা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? তিনি রাজাকে অতি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় মনে করিলেন। এতক্ষণ তিনি রাজাকে আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছিলেন, এবারে আর তাহা পারিলেন না। রাজার নীচ ব্যবহারে শকুন্তলার মুখ হইতে 'অনার্য্য' কথাটি আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন :—"অনার্য্য, আপনার মত সকলকে দেখ! তোমার মত ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ভিতরে অধর্ম্ম পোষণ কে করিবে? তুমি উপরে ঘাসে ঢাকা গভীরগর্ত্ত কূপের মত অতি ভয়ঙ্কর।"

ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। ধর্ম্মবলের তুল্য আর বল নাই। এই বলের কাছে বনের বাঘ পর্য্যন্তও পরাজিত হয়। যাহার অন্তরে পাপ নাই তাহার মুখনিঃসৃত বাক্য বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার ন্যায় অপরকে অভিভূত করে। সে বাক্যে এমনি একটি অলক্ষিত শক্তি থাকে যে, অতি নৃশংস, অতি দুরাচারও তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করে। শকুন্তলার তীব্র ও অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য দুষ্মন্তের অন্তরতম প্রদেশে যাইয়া আঘাত করিল। রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার জ্ঞান যেন সহসা ফিরিয়া আসিল। তিনি যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য বলিতেছিলেন, সেই মোহ যেন ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন :—

"ইনি ক্রোধ করিয়াছেন। এ ক্রোধ অকৃত্রিম ক্রোধ। ইনি বনবাসিনী; ইহাঁর ভিতরে কৃত্রিমতা নাই,—ইনি সরল। দেখ না, দৃষ্টি বক্র নহে। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। অতি কঠোর স্বরে বলিতেছেন, অথচ পদস্খলিত হইতেছে না। বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর শীতার্ত্তের মত কাঁপিতেছে; স্বভাবতঃ বক্র ভ্রূদ্বয় এক সঙ্গে বক্র হইয়াছে। কৃত্রিম কোপে এ সকল সম্ভব হয় না। তখন দৃষ্টি সরল থাকে না, চক্ষু রক্তবর্ণ হয় না, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে গিয়া পদস্খলিত হয় (ঠেকিয়া যায়), অধর ওভাবে কাঁপে না আর কৃত্রিম কোপে ভ্রূদ্বয়ও এরূপ যুগপৎ বক্রাবক্র হয় না।" পাঠক! একটু থামুন, কবির বাহাদুরীটা একবার দেখুন। কি অন্তর্দৃষ্টি! কি সূক্ষ্মদর্শিতা!

রাজা আবার বলিতেছেন :—"ইহাঁর কোপ ছলনাশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আমাকে সন্দিগ্ধমনা করিতেছে। দেখ—বিস্মৃতি বশতঃ আমি অতি কঠোরভাবে ব্যবহার করিতেছি, বিজনে ঘটিত প্রণয় স্বীকার করিতেছি না; তাই তিনি ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়া আমার প্রতি ভ্রূভঙ্গি করিতেছেন, যেন মদনের শরাসন ভগ্ন করিতেছেন (অর্থাৎ প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিতেছেন)।"

রাজা এবারে আর এক সমস্যায় পড়িয়াছেন। এবারে তিনি আর শকুন্তলাকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। শকুন্তলার চরিত্রের বল তাঁহার মনের গতিকে ফিরাইয়া দিয়াছে; কিন্তু রাজার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। শকুন্তলাকে অবিশ্বাস না করিলেও তাঁহার নিজের মনশুদ্ধির জন্য পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে তিনি কি প্রকারে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবেন? তাই তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন :—"আর্য্যে! দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আপনি যে আমাকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের সহিত তুলনা করিলেন, তাহা আমি নহি—আমার প্রজাদের মধ্যেও এমন কেহ নাই।"

শকুন্তলা বলিলেন :—"বেশ! আমি পুরু-বংশের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া এই 'মুখে মধু অন্তরে গরল' ব্যক্তির হস্তগত হইয়া আজ স্বৈরচারিণী হইলাম।" এই বলিয়া শকুন্তলা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হায়! হায়! এ দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! শকুন্তলা এতক্ষণে বুঝিলেন যে দুষ্মন্তের মন কিছুতেই ফিরিবে না।

আর তাঁহার থাকিল কি? লতা কি কখনও বৃক্ষ ছাড়া থাকিতে পারে? হিন্দু রমণী কখনই স্বাধীন নহে। আশ্রয়শূন্য হইয়া হিন্দু রমণী এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারে না। দুষ্মন্তের শেষ উক্তিতে শকুন্তলা বুঝিলেন যে, তাঁহার পিতৃকুল-শ্বশুরকুল উভয় কুলই গিয়াছে। তিনি নিঃসহায়! তিনি স্বৈরচারিণী। হিন্দু রমণী স্বৈরচারিণী! ইহা অপেক্ষা জগতে আর কি কলঙ্ক আছে? শকুন্তলা চারি-দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। এ পাপ মুখ

তিনি আর কি প্রকারে দেখাইবেন? নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শাঙ্গ‍্‍রব উগ্রস্বভাব ও ন্যায়বাদী। যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার মনে হয়, তাহা তিনি বলিতে ছাড়েন না। এই দুঃসময়েও তিনি শকুন্তলাকে কটাক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বলিতে ছাড়েন নাই। "চপলতাকে দমন করিতে না পারিলে এইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। গান্ধর্ব্ব বিবাহাদি যাহা অতি সংগোপনে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া করিতে হয় (কেন না, তাহার সাক্ষী নাই)। অজ্ঞাত হৃদয়ের প্রণয় এইরূপ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।" কথাটিতে দুষ্মন্তের প্রতিও বিলক্ষণ কটাক্ষ আছে। দুষ্মন্ত তাহা বুঝিলেন—বুঝিয়া বলিলেন:—

"মহাশয়, আপনি ইহাঁরই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার প্রতি এতগুলি দোষারোপ করিয়া আমাকে ব্যথিত করিতেছেন।"

শাঙ্গ‍্‍রব সকোপে বলিলেন:—"আপনারা শুনলেন, উচ্চ হলো নীচ, নীচ হলো উচ্চ! যে ব্যক্তি জন্মে কখনও বঞ্চনা শিখে নাই সেই ব্যক্তির বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নহে, আর যাহারা অন্যকে কি প্রকারে বঞ্চনা করিতে হয় তাহাই বিদ্যা বলিয়া শিখে তাহাদের বাক্য বিশ্বাস-যোগ্য!"

শাঙ্গ‍্‍রবের নূতন বিদ্যা। গুরুর নিকট নিয়ত বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি কূট রাজনীতিকে বঞ্চনার বিদ্যা মনে করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

রাজা ইহা শুনিয়া অল্প চটিলেন; কিন্তু সে রাগ কর্কশ ভাবে প্রকাশ না করিয়া একটু ঠাট্টাচ্ছলে বলিলেন:—"হে সত্যবাদী! মনে করুন আমরা বঞ্চনাবিদ্যা শিক্ষা করি এবং আমরা বঞ্চনা করি, ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম; এখন জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, এই ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কি লাভ করিব?"

রাজার প্রশ্নের সদুত্তর শাঙ্গ‍্‍রবের দেওয়া উচিত ছিল। সদুত্তর কি নাই? অবশ্যই ছিল। কিন্তু শাঙ্গ‍্‍রব সে পথে যান নাই। রাজার উপর তাঁহার রাগ হইয়াছিল, সেই রাগের মুখে বলিয়া ফেলিলেন:—"বিনিপাত"। আর কি লাভ? ঘোর নরকে পতন অথবা ধ্বংস হইবে।

বড়ই কঠোর উক্তি! ঋষিমুখে এরূপ বাক্য—অভিসম্পাত। রাজার মন বিশুদ্ধ। তিনি এই অভিসম্পাততুল্য বাক্য শুনিয়াও ভীত হইলেন না, ক্রুদ্ধ হইলেন না, ঋষিকুমারের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলেন না। তিনি অতি ধীরভাবে বলিলেন—

"বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে অশ্রদ্ধেয়মেতত্।"

পুরুবংশীয়েরা বিনিপাত প্রার্থনা করে এ উক্তি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

শারদ্বত শাঙ্গ‍্‍রবের ন্যায় উদ্ধতপ্রকৃতি নহেন। তাঁহার বিদ্যা কিছু পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে। তিনি দেখিলেন, এরূপ কথা-কাটাকাটিতে কোন ফল নাই। যতক্ষণ না রাজার মনে কর্ত্তব্যজ্ঞান আসিবে, ততক্ষণ তাঁহাকে তর্কবিতর্কের দ্বারা কেহই গ্রহণ করাইতে পারিবে না। এ সব প্রবৃত্তির বিষয়—তর্কের বিষয় নহে। প্রবৃত্তি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ বিশ্বাস না আসিবে ততক্ষণ অন্য চেষ্টা বৃথা। গুরুর নিয়োগ ছিল শকুন্তলাকে স্বামীর কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাহা হইয়া গিয়াছে; তবে আর কেন বাক্‌বিতণ্ডা—স্বামী গ্রহণ করুন আর নাই করুন তাঁহাদের তাহা দেখিবার প্রয়োজন কি? দেখিয়াই বা কি করিতে পারেন? তাই শারদ্বত শাঙ্গ‍্‍রবকে থামাইয়া বলিলেন:—

"অনুষ্ঠিতো গুরুনিয়োগঃ। প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ং।"

গুরুর আদেশ পালন করা হইয়াছে; এখন চল ফিরিয়া যাই। রাজাকে বলিলেন:—"এই আপনার পত্নী—ত্যাগ করুন বা গ্রহণ করুন, কেন না স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ প্রভুতা।"

পালা এইখানে সাঙ্গ হইল। ঋষিকুমারদ্বয় প্রস্থান করিলেন। গৌতমী তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা এখন কি করেন? তাঁহার যে দুকুল নষ্ট। স্বামী ত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। পিতৃকুলও যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। এখন যান কোথায়? এই অপরিচিত রাজভবনে যে তিনি ব্যভিচারিণী! এখানে কি

তাঁহার স্থান আছে ? বিপন্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—"কি হলো ! আমি এই বঞ্চক কর্ত্তৃক বঞ্চিত হলাম আর তোমরাও ছেড়ে চলে যাচ্ছ ?" এই কথা বলিয়া শকুন্তলা তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

গৌতমীর কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি থামিলেন এবং বলিলেন :—"বৎস শার্ঙ্গরব ! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। হায় ! হায় ! বাছা কি-ই-বা করিবে ? স্বামী কঠোরভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।" এবারে শকুন্তলা শার্ঙ্গরবের নিকট অপরাধিনী হইলেন। শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন :—"পুনঃপুনঃ অন্যায়াচারিণি ! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ ?" শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কি বিপদ ! পিতা তাঁহাকে স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন তিনি ত স্বামীর অধীন, তাঁহার আদেশ ভিন্ন এক পা-ও চলিবার অধিকার নাই। এদিকে স্বামী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার কর্ত্তব্য কি ?—স্বামীর নিকটে আত্মসমর্পণ করা। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। এ কঠোর কর্ত্তব্য পালন বড় সহজ নহে। শার্ঙ্গরব কিন্তু শকুন্তলাকে ক্ষমা করিলেন না। গুরুতররূপে ভর্ৎসনা করিয়া তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন :—

"শকুন্তলে ! রাজা যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয় তবে তুমি কুলটা। তোমার পিতার তুমি কি প্রয়োজনে আসিবে ? আর যদি জান যে তোমার কার্য্যে কোন পাপ নাই, তবে স্বামীকুলে দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে ভাল। তুমি এখানে থাক আমরা চলিলাম।"

কথা তো ঠিক, কিন্তু প্রাণে সয় কত ? এই কঠোর সত্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনাকে কতদূর কঠোর করিতে পারে ? এই বিষম আঘাত কি মানুষ সকল সময়ে সহ্য করিতে পারে ? হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর যে অবসন্ন হয়। এক হাতে চক্ষের জল মুছিতেছে অন্য হাতে কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, সংসারে এই ভীষণ দৃশ্যের কি কিছু অভাব আছে ? ইহাই সংসার ! ! ভীষণ পরীক্ষার স্থান। হে ভগবন্ ! এই অবলার প্রতি এই পরীক্ষার বিধান কেন ?

পাঠকবর্গ ! আপনারা সকলে এই তাপসবালার অবস্থার বিষয় ভাবিয়া সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জ্জন করুন। আর আমরা কি করিতে পারি ? কে কার কি করিতে পারে ? ঐ সহানুভূতি ! আর কি ?

অভিভাষণ।

(মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়)

পুরাকালের সে খৃষ্টানী ভাষা আর নাই, আর সে পণ্ডিত মহাশয়গণের সমাসবহুল সংস্কৃত ভাষা আদর পায় না, "হুতুমি" ভাষার দিনও এখন চলিয়া গিয়াছে; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের গদ্যসাহিত্য এখন যে মূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহা লীলাময়ী ও তেজোময়ী, সে ভাষা এখন বাঙ্গালীর প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া কহিতে পারে এবং পরকেও সে কথা শুনিবার জন্য অবহিত করিতে পারে। আর সে চৌদ্দ অক্ষরের কায়ক্লেশের মিল নাই, সে বৈচিত্র্যহীন, জীবনহীন কবিতার ছন্দ এখন প্রাণের স্পন্দনে নৃত্যশীল। কোথাও গম্ভীর, কোথাও ললিতভঙ্গে লীলায়িত গতিতে ধাবমান হয়, কোথাও অগ্নি বিকীরণ করে, কোথাও পাষাণ গলাইয়া তাহারই সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়।

সত্যই এখন স্থিরচিত্তে ভাবিবার সময় আসিয়াছে আমরা কি চাই, আমাদের প্রার্থিত কাম্যপদার্থ কি ? চাই জাতি-সংগঠন, চাই জাতীয় জীবন। যে পরমবস্তু দান করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাহিত্য পূজা পাইতেছে আমরাও তাহাই চাই। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন,—বড় দুঃখে, বড় ব্যথায় গাহিয়াছেন "আবার তোরা মানুষ হ।" আমরা বঙ্গসাহিত্যকে এমনি ভাবে গঠন করিতে চাহি যেন মানুষ হইতে পারি, আমরা যেন হাটের হট্টরোলের মধ্যে দেবীর সাধনায় নিযুক্ত না হই, আমরা যেন ডাকের গহনায় ভুলিয়া মাণিক না হারাইয়া ফেলি—আমরা যেন উষর ভূমির কণ্টক গুল্মে ঘিরিয়া অমৃতফলপ্রদ শিশু কল্পবৃক্ষটিকে বিশুষ্ক হইতে না দিই। বাঙ্গালার সমবেত সাহিত্যিক সজ্জনগণের নিকট আমার জরাগ্রস্ত জীবনাপরাহ্ণের চরম নিবেদন এই যে, আপনাদের পুণ্যে পবিত্র হইয়া যেন আমরা সর্ব্বকায়মনে বাঙ্গালী হইতে পারি ; আপনারা যে বিরাট বঙ্গসাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এখনও তাহার গঠন বিষয়ে সকল মন-প্রাণ দিয়া সচেষ্ট রহিয়াছেন, যাহার শাখা-প্রশাখা নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের কুসুমরাশিতে সুশোভিত হইয়াছে ও হইবে, সেই মহামহীরুহের ছায়াতলে থাকিয়া আমরা যেন বঙ্গে

জাগরণে একমাত্র বর প্রার্থনা করি যে—হে দেবতা, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বাঙ্গালী হই এবং বাঙ্গালীই থাকি।

আজ আমার বাঙ্গালার আশুতোষের—ভারতের আশুতোষের—সারগর্ভ সেই পরম বাণী বারম্বার মনে আসিতেছে,যাহা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত তরুণ যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষতম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যেন সর্ব্বদা স্মরণ করেন যে, মাতৃ ভাষার মধ্য দিয়াই তাঁহারা দেশের সকল জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন, এবং বিদেশের উপাদেয় জ্ঞান-সম্পদ যাহা তাঁহারা আহরণ করিতেছেন তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই দেশবাসীর মধ্যে প্রচারিত করিতে পারিবেন ; আহার ও পরিচ্ছদের ক্ষুদ্র মোহে মুগ্ধ হইয়া যেন ভুলিয়া না যান যে তাঁহারা বাঙ্গালী; সর্ব্বকালে, সকল অবস্থাতেও ও সর্ব্বত্র মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহারা বাঙ্গালী, ধর্ম্মে কর্ম্মে, অশনে বসনে, দেহে মনে প্রাণে তাঁহারা বাঙ্গালী।

আমাদের কথা-সাহিত্যের গতি দেখিলে মনে হয় যে, আমরা ক্রমে ক্রমে যেন এই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হই-তেছি। প্রতীচীর সামাজিক আদর্শ আমাদের কথা-সাহিত্যের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছে কি না সে কথার বিচার আপনারা করিবেন। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে ক্রমে বিলাতী সমাজের চিত্র যেন আমাদের কথাসাহিত্যের অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রাচী ও প্রতীচীর সম্মিলন বাঞ্ছনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সম্মিলন ঘটাইতে যদি প্রাচীর আদর্শকে একে-বারে বিলুপ্ত করিতে হয়, বহু যুগ-যুগান্তের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া প্রাচ্য সমাজের উৎকৃষ্টাংশ যাহা আজও জীবিত আছে তাহাকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়, তবে সে সম্মিলন সুখের হইবে কি দুঃখের হইবে, তাহাতে আমাদের সমাজ ও সাহিত্য লাভবান হইবে কি না, সে কথার মীমাংসাও আপনাদেরই কর্ত্তব্য। পশ্চিমের সূর্য্যাস্ত সময়ের বর্ণ-বৈচিত্র্যকে প্রাচী দিগ্বিভাগে আনিতে গিয়া পূর্ব্বের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের ধ্বান্ত-বিধ্বংসী অরুণলেখার মঙ্গলালোকের বিলোপ সাধন করা কর্ত্তব্য কি না ইহা ধীরচিত্তে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের প্রাণ সেইখানে স্পন্দিত হইতেছে যেখানে ম্যালেরিয়ার মহামারী জীবধ্বংসে নিযুক্ত থাকিয়া শ্মশানের চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেয় না, বাঙ্গালার সম্পদ সেইখানে যেখানে চণ্ডীমণ্ডপের অলিন্দে বসিয়া হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি রুষ্ট বিষধরের ন্যায় নিয়ত গর্জ্জন করিতেছে, বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব সেই জীর্ণ গৃহ-কোণের অন্ধকারে, যেখানে নারী তাহার ছিন্ন বক্ষাঞ্চল দ্বারা মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ বর্ত্তিকাটুকু আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, যেন বাহিরের বাতাহত হইয়া উহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইতে না পারে।

বঙ্গবাণীর সাধককবর্গকে সাহিত্যের তরণী সেই দিকে পরিচালিত করিতে হইবে ; গল্পে গানে নাটকে উপন্যাসে বাঙ্গালা বাঙ্গালী ও বঙ্গসমাজকে চিত্রিত করিতে হইবে। কেবল চামচ সংযোগে চার পেয়ালার ঠুন্ ঠুন্ রব, পর্দ্দাহীন হাওয়া গাড়ীতে ফর্দ্দা হাওয়ায় গৃহলক্ষ্মীগণের সান্ধ্যবায়ু-সেবন, স্ত্রী-পুরুষের একত্র সান্ধ্যসম্মিলন উপলক্ষে পিয়ানো সংযোগে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত-সুধাবর্ষণের চিত্র অঙ্কিত করিলে চলিবে না। এ সকলেরও হয়ত বা প্রয়োজন আছে ; কিন্তু ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, আমরা পূর্ব্বদেশবাসী, পশ্চিমের সার গ্রহণ করিয়া আমরা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইব, কিন্তু পূর্ব্বকে একেবারে বিস্মৃত হইব না, বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিবার মোহে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলে চলিবে না।

সমাজ যেমন সাহিত্যের বুকে দাগ দেয়, সাহিত্যও তেমনি সমাজকে চিহ্নিত করিতে ছাড়ে না। কেবল তাহাই নহে। সমাজ যেখানে শক্তিহীন, সাহিত্য সেখানে প্রবল—সমাজ যেখানে মূক, সাহিত্য সেখানে কলকণ্ঠ—সমাজ যেখানে নিদ্রিত, সাহিত্যের পাঞ্চজন্য সেখানে বজ্র-রবে নিদ্রিত সমাজের সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে জাগ্রত ও সচেতন করিয়া তুলে।

আমাদের বৃদ্ধ সমাজ নিয়ত উদ্যতখড়্গ হইয়া আমা-দিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিতে চাহিতেছে না। সে বুঝিতে চাহে না যে কালের গতির সহিত সমপাদ-বিক্ষেপে চলিতে না পারিলে আমরা ভগ্নচক্র রথের ন্যায় চিরকাল পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াই থাকিব, অথচ আমাদের যেখানে যে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিলেও আমরা কিম্ভুতকিমাকার হইব তাহাও জানি না। তাই নিবেদন করিতে চাই যে, আমাদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া, সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁহারা তাঁহারা এমন সাহিত্য গঠন করুন যাহাতে আমাদের পুরাতনের জীর্ণ সংস্কার হইয়া তাহা নবরূপ ধারণ করিতে পারে—ইষ্টকালয়ের মধ্যে যে বটবৃক্ষ তাহার মূল প্রোথিত করিয়া দিয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা না করিতে পারে—ধ্বংসকারী বৃক্ষের মূল উৎপাটিত করিতে হইবে, কিন্তু মন্দির ভাঙ্গিবে না। আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয়জীবন গঠিত করিতে চাই, নবজীবনের আনন্দে আমরা প্রফুল্ল হইতে চাই, দেশবাসী পরস্পরে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বঙ্গবাণীর চরণকমলে আত্মনিবেদন করিতে চাই। আমরা সুন্দর হইতে চাই, কিন্তু ঋণলব্ধ

বসনভূষণে নহে, আমরা পুষ্ট হইতে চাই দেশজাত ঘৃত ও দুগ্ধে, বিদেশের পেটেণ্ট ঔষধে বা টিনের খাদ্যে নহে।

আজ যেখানে আসিয়া আমরা দণ্ডায়মান হইয়াছি। ইহা নবযুগের প্রারম্ভ; অপগতপ্রায় শর্ব্বরীর শেষ অন্ধকারটুকু এখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই, মন্থরপদে সমাগত অরুণের রক্তরাগ ঈষৎ দেখা দিয়াছে মাত্র। এই নবীন যুগের সন্ধি-সময়ে আমরা নবীন কর্ম্মশক্তি চাই, বহ্নির মত তেজশালী দীপ্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আমরা চাই, সমস্ত সাহিত্য সেই তেজে পূর্ণ হইলে তবেই আমাদের সাহিত্য সাধনা সফল হইবে।

আজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবীর কথা উঠিয়াছে, তাহাকে মানিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেমন তাহাকে মানিতে হইবে তেমনি তাহাকে সংযতও করিতে হইবে। সমাজে যাহার বাস নহে, সে যাহা ইচ্ছা দাবী করুক তাহাতে জগতের ইষ্টানিষ্ট নাই। কিন্তু সমাজে কি নর কি নারী যিনিই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিবেন, তাঁহাকে মূল্য দিতে হইবে। নিজের স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে সংযত করিলে তবে সেই স্বাতন্ত্র্যের সম্মান সমাজের নিকট হইতে পাইবার ও লইবার সামর্থ্য হইবে; নিজের স্বার্থকে কতকাংশে সংযত করিলে, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিলে আমার দাবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিব; সে সময়ে যদি দেখি সমাজ আমার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যতাস্ত্র হইয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে আমি প্রহরণ ধারণ করিবার শক্তিলাভ করিব; সেই শক্তি সাহিত্যের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চাই, সাহিত্যের দ্বারাই তাহাকে পরিচালিত করিতে চাই, সাহিত্যেরই তাহার প্রাণশক্তিকে উদ্দীপিত করিতে চাই।

আজকাল শুনিতে পাই বঙ্গসাহিত্যে "আর্টের" প্রতিপত্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই আর্ট কি বর্ত্তমানের আমদানি, না প্রাচীনকালেও ছিল? যাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কুমার প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সময়ে আর্ট ছিল কি না সে কথার বিচার ও মীমাংসা সম্মিলনের সুধীবর্গ করিবেন, আমি সে কথার কোনরূপ উত্তর দিবার উপযুক্ত নহি। যতটুকু সংস্কৃত বা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত গীতিকাব্য প্রভৃতি পাঠ করিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে যে, আর্ট যেখানে সুন্দর সেখানে কবির লেখনী অমৃতনিস্যন্দিনী হইয়া অবারিত মুক্ত প্রবাহে ঝর ঝর করিয়া রসধারা ঢালিয়া দিয়াছে। কারণাধীনে রামায়ণে মহাভারতে কিংবা তাদৃশ অপর কোন গ্রন্থে যেখানে অসুন্দর আর্টের ছবি অঙ্কিত করিতে হইয়াছে, সেখানে কবি বহু সন্তর্পণে নানাবিধ কৈফিয়তের অবতারণা করিয়াছেন, ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছেন। এ কালে চিত্রে ও রচনায় আর্ট এরূপ ভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে যে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয়, মানুষ ও সমাজের জন্য আর্টের সৃষ্টি হইয়াছে, না আর্টের জন্য মানুষ ও সমাজ? আজ আর্টের দাবী এমন ভাবে দাঁড়াইয়াছে যে এখনই উহা বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে এবং বাঙ্গালায় গভীর মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমি কবি নহি, আমি সাহিত্যিক নহি, কিন্তু কবিতায় যে মাধুর্য্য রহিয়াছে তাহা আমি ভালবাসি। কাব্যের সৌন্দর্য্যের নিকট আমার হৃদয় নিয়তই অবনত হইয়া পড়ে। আমি সেই সুন্দরকে চাই, যিনি ক্ষণিকের আনন্দপুলক দিয়াই অন্তর্হিত হন না, যিনি মধুর প্রলেপযুক্ত হলাহল বটিকায় আমাকে প্রলুব্ধ করেন না; আমি সেই সুন্দরকে চাই যিনি সত্য এবং শিব, আমি তাঁহাকেই চাই যিনি দীপ্তিমান অথচ শান্ত, যাঁহার মঙ্গলময় উজ্জ্বলালোকে আমাদিগের দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, কিন্তু তাপ আমাদিগকে দগ্ধ করে না। এখন শুনিতেছি কবিগণ কেবল রস সঞ্চারই করিবেন, লোকশিক্ষকের আসন গ্রহণ করিবেন না; গুরুমহাশয়গণের ন্যায় বেত্রপাণি হইয়া লোককে শিক্ষা দিবার ভার তাঁহাদের উপরে নাই। কথাটা শুনিলে একটু ভীত হইতে হয়, ইহারও মীমাংসা যাঁহারা বর্দ্ধমান বঙ্গ-সাহিত্যের অভিভাবক তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। যে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে বঙ্গ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার যতটুকু জানি, তাহাতে মনে হয় যে, সে সাহিত্যের মূলমন্ত্র এই যে কবিরাই প্রধান লোকশিক্ষক।

উত্তরচরিতের সমালোচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন, চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতিব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না, তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য। * * * কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্যপ্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে, সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক।" কবি পরদারাপহারী রাবণ বা পরস্বাপহারী দুর্য্যোধনকে অঙ্কিত করিলেন, তাহার পার্শ্বেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রামচন্দ্র ও ধর্ম্মের অবতার যুধিষ্ঠিরের চিত্রও আমাদের নয়ন সম্মুখে ধরিলেন; মূর্ত্তিমতী পতি-দেবতা সীতা ও স্বৈরিণী সূর্পণখার চিত্রদ্বয়ও একত্রে আমরা দেখিতে পাইলাম। কবি বেত্রপাণি হইয়া গুরুমহাশয়ের ন্যায় আমাদিগকে বলিলেন না যে একের অনুকরণ কর, অপরের করিও না; কিন্তু চিত্রগুলি এমন ভাবেই অঙ্কিত হইল যে আমাদের চিত্ত স্বতঃই রাম যুধিষ্ঠির সীতার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়িল, রাবণ-সূর্পণখার কথায় সমস্ত অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। *

---

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—১৩৩২ বৈশাখ-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

নিভৃতে।

মালকোষ—একতালা।

নিভৃত কুটীরে বসিয়া বসিয়া
অসীম চরণে হৃদয় খুলিয়া
একাকী গাহিছি গান।
বিশ্বের গান
প্রেমের গান
অনন্ত মহিমা গান
দুঃখ শোক পরিত্রাণ॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২´ ৩ ০ ১ ২´
II মা জ্ঞা সা। সা ণ্দা দণা। ণ্সা সমা মা। মা মা মা I মজ্ঞা জ্ঞা মা।
নি ভৃ ত কু টী॰ রে॰ ব॰ সি॰ য়া ব সি য়া অ সী ম

৩ ০ ১ ২´ ৩
। মদা দণা দর্ণসা। র্সা র্সা ণদা I দা মা মজ্ঞা I মা মর্সা র্সা। ণা দা মা।
চ॰ র॰ ণে॰ হৃ দ য়॰ খু লি য়া॰ এ কা॰ কী গা হি ছি

০ ১
। জ্ঞমদণা র্সা ণা। দা মা জ্ঞমা II
গা॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ন্

২´ ৩ ০ ১ ২´
II { মজ্ঞা -া মা। মা দদা -ণা। দণদা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া } I ণা র্সণা র্সা।
বি ॰ শ্বে র গা ন্ প্রে॰ ॰ মে র গা ন্ অ ন ॰

৩ ০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্মা। র্মর্মা র্জ্ঞা র্মর্মা। র্জ্ঞর্সা র্সা -া I র্সা র্সা ণা। দা মা মা।
ন্ত ॰ ম হি॰ ॰ মা॰ ॰॰ গা ন্ দুঃ খ শো ক প রি

০ ১
। জ্ঞমদণা র্সা ণা। দা মা জ্ঞমা II II
ত্রা॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ণ্

"নিভৃত কুটীরে বসিয়া বসিয়া" পর্য্যন্ত গাহিয়া—

২´ ৩ ০ ১
১। সমা মমা জ্ঞজ্ঞা। মমা জ্ঞসা ণসা। জ্ঞমা দণা র্সর্সা। ণণা দমা জ্ঞমা II
॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

২´ ৩ ০ ১
২। র্সর্সা ণদা মদা। ণর্সা ণদা ণণা। দমা জ্ঞমা ণণা। দমা জ্ঞমা জ্ঞসা II
॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

২´ ৩ ০ ১
৩। মজ্ঞা সণা সজ্ঞা। মদা ণর্সা র্জ্ঞর্সা। ণদা র্সণা দমা। জ্ঞমা জ্ঞসা ণসা II
॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

অন্তরার তান—"বিশ্বের গান প্রেমের গান" পর্য্যন্ত গাহিয়া—

```
     ২´              ৩           •            ১
১ ।  জ্ঞমা দণা র্সা ।  ণা দা ণা ।  র্সঃ র্মাঃ র্জ্জা ।  র্সা ণদা ণা I
     ••   •• ••      •  •  •     •   •    •       •  ••  •

     ২´             ৩              •              ১
২ ।  র্সর্সা ণদা ণণা ।  দমা জ্ঞমা দণা ।  র্সর্ণা দণা র্সর্জ্জা ।  র্মর্মা র্জ্জর্সা ণর্সা II
     ••   ••  ••      •• ••  •      ••   ••  ••       ••   ••   ••
```

জাতীয় সঙ্গীত।

হও ধরমেতে ধীর।

(শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন বার-এট-ল)

মিশ্র ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

সকলে— হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্ ;
দেখিয়া ভারতে মহা জাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়!
জগজন মানিবে বিস্ময়!

সকলে— হও ধরমেতে ধীর ··· ··· ··· হবে জয়।
তেত্রিশ কোটী মোরা নহি কভু ক্ষীণ
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন;
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—
ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!
ঐ দেখ প্রভাত উদয়!

সকলে— হও ধরমেতে ধীর ··· ··· ··· হবে জয়।
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে.
সত্যের নাহি পরাজয়!
সত্যের নাহি পরাজয়!

সকলে— হও ধরমেতে ধীর ··· ··· ··· হবে জয়।

কথা ও স্থর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ • ১´ •
{ সা রা II গা গা গা গা | গা -া মা গা I মা গা রা রা | রা -া গা মা I
হ ও ধ র মে তে ধী র্ হ ও ক র মে তে রী র্ হ ও

১´ • ১´ •
I পা -া গা গা | সা -া রা গা I সা -া -া -া | -া -া } র্সা না I
উ • ন্ন ত শি র্ না হি ভ • • • • য়্ ভু লি

১´ • ১´ •
I র্সা না ধা -া | ধা -া ণা ধা I ণা ধা পা পা | পা -া পা পা I
ভে দা ভে দ্ জ্ঞা ন্ হ ও স বে আ গু য়া ন্ সা থে

১´ • ১´ •
I পা ণা ধা পা | মা -া পা ধা I গা -া -া -া | -া -া সা রা II
আ ছে ভ গ বা ন্ হ বে জ • • • • য়্ "হ ও"

১´ • ১´ •
-া -া II { না -া না -া | না না না না I না না ধা না | র্সা -া -া -া I
• • (১) না না ভা ষা না না ম ত্ না না প রি ধা • • ন্
(২) তে • ত্রি শ্ কো টি মো রা ন হি ক ভু ক্ষী • • ণ্
(৩) ন্যা • য় বি রা • জি ত যা দে র ক রে • • •

১´ • ১´ •
I পা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা না I ধা না র্সা না | ধপা -া -া -া } I
(১) বি বি ধে র্ মা ঝে দে খ মি ল ন ম হা • • ন্
(২) হ তে পা রি দী ন্ ত বু ন হি মো রা হী • • ন্
(৩) বি • ম্ন প রা • জি ত তা দে র শ রে • • •

১´ • ১´ •
I { মা ণা ধা ণা | ধা ণা ধা ণা I ধা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া } I
(১) দে খি য়া ভা র তে ম হা জা তি র উ থা • • ন্
(২) ভা র তে জ ন ম পু ন আ সি বে স্থ দি • • ন্
(৩) সা • ম্য ক ভু • না হি স্বা • র্থে ড রে • • •

১´ • ১´ •
I র্সা ণা ধা পা | মা মা গরা গা I মা -া -া -া | -া -া -া -া I
(১) জ গ জ ন মা নি বে • বি স্ম • • • • • • য়্
(২) ঐ • দে খ প্র ভা ত • উ দ • • • • • • য়্
(৩) স • ত্যে র না হি প • রা জ • • • • • • য়্

১´ • ১´ •
I মা -া মা মা | গা গা রা গা I সা -া -া -া | -া -া সা রা II II
(১) জ গ জ ন মা নি বে বি স্ম • • • • য়্ হ ও
(২) ঐ • দে খ প্র ভা ত উ দ • • • • য়্ "হ ও"
(৩) স • ত্যে র না হি প রা জ • • • • য়্ হ ও

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

প্রিয়তম।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল ঠুংরী।

প্রিয়তম তুমি এলে না
এলে না—এলে না।
আশা-পথ চেয়ে, দিন গেল বয়ে
ব্যথা-ভরা হিয়ে
সুধা দিলে না—দিলে না।

জর জর মোর প্রাণে
এস প্রিয় প্রেম-গানে
ভাঙ্গা-বীণা ভরি' তানে
করে নিলে না—নিলে না॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সা সা II { সা -পা পা -া। -া -া পা পা I পা ধপা ধপা -া। -মা -া গা গরসা I
প্রি য় ত ০ ম ০ ০ ০ তু মি এ লে না ০ ০ এ লে ০

[-া -া]
I সরা -গমা -গা -া। -া -া সা ন্‌া I সা -া -া -া। -া -া সা সা } I ন্‌া ন্‌া -া -া।
না০ ০০ ০ ০ ০ ০ এ লে না ০ ০ ০ ০ ০ "প্রি য়" আ শা ০ ০

। -ন্‌া -ধ্‌া প্‌া প্‌া I ধন্‌া -সরা সা -া। -া -া -া -া I রা গা মা পা। -া -া -া -া I
০ ০ প থ চে০ ০০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ দি ন গে ল ০ ০ ০ ০

I ধা ধপা -ধপা -া। -মা -া -া -া I সা মা মা মা। -া -া -া মা I
ব য়ে০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ব্য থা ভ রা ০ ০ ০ হি

I -পমা -পমা -পমা -া। -গা -া সা রা I সা রা সরা -গমা। -গা -া সা ন্‌া I
য়ে০ ০০ ০০ ০ ০ ০ সু ধা দি লে না০ ০০ ০ ০ দি লে

I সা -া -া -া। -া -া সা সা II
না ০ ০ ০ ০ ০ "প্রি য়"

II পা পা না না। -া -া না র্সা I ধনা -র্সর্রা র্সা -া। -া -া -া -া I
জ র জ র ০ ০ মো র প্রা০ ০০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্রা র্সর্রা র্সা। ণা -া ধা ণা I ধর্সা -ণধা পা -া। -া -া -া -গা I
এ স প্রি য় ০ ০ প্রে ম গা০ ০০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I মা ধা ধা ধা। -া -া ধা র্সা I ধর্সা -ণধা পা -া। -া -া সা রা I
ভা ঙ্গা বী ণা ০ ০ ভ রি তা ০০ নে ০ ০ ০ ক রে

I সা রা সরা -গমা। -গা -া সা ন্‌া I সা -া -া -া। -া -া সা সা II II
নি লে না০ ০০ ০ ০ নি লে না ০ ০ ০ ০ ০ "প্রি য়"

রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

দেশবন্ধু সমগ্র ভারতবর্ষকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। এই দেশবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে বিগত ৫০।৫৫ বৎসর ধরিয়া যে-সব ছোট-বড় আন্দোলন এদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার আলোচনা বিশেষরূপে আবশ্যক। তাহা না হইলে প্রাগুক্ত মহাত্মাগণের বিশেষত্ব ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহাঁদের প্রকৃত স্থান অবধারণ করা অসম্ভব। এক ভাবে বলিতে গেলে এদেশে যে-কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার বীজের মূল পত্তন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হইতে। তিনি নানা দিকে আমাদের চক্ষুকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতে গিয়া Court of Director গণের নিকটে ভারতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যান, তাহা পাঠ করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি। তিনি মুসলমানধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম সমস্তই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন; হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া বাইবেলের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ঐ দুই ধর্ম্ম হইতে তিনি একেশ্বরবাদ সংস্থাপনের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া গেলেন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের ভিতর দিয়া। এইখানেই তাঁহার দেশাত্মবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাই। তিনি আপনার দেশকে আপনার সমাজকে এমনই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার উপরে এদেশে বিদ্বেষ জাগিতে আরম্ভ করিল। কবি রঙ্গলালের বিরচিত "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়" কবিতা যাহা আমরা বাল্যে পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা আজও কর্ণে সবলে বাজিতেছে। তাহার পরবর্ত্তী স্তরে আদিব্রাহ্মসমাজের ও ঠাকুরপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নবগোপাল মিত্রের বিশেষ উদ্যোগে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের দুই-তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তন। ঐ একই কথা আরও পরিস্ফুট আকারে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথের লেখনী হইতে বাহির হইল এবং হিন্দুমেলায় শতকণ্ঠে গীত হইল "জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়"। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় ঐ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সমবেত জনমণ্ডলীর অন্তরে নবভাবের উদ্রেক করিল। হিন্দুমেলা চারি-পাঁচ বৎসর পরে বিলীন হইয়া গেল।

তাহার পরবর্ত্তী রাজনৈতিক যুগের প্রবর্ত্তক শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার ওজস্বিনী প্রতিভা সমগ্র ভারতকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া নবজাগরণ এদেশে আনয়ন করেন। তাঁহার বজ্রনির্ঘোষী নিনাদ আমাদের কর্ণে আজও লাগিয়া রহিয়াছে। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে এবং পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের নিকটে দেশের দুর্দ্দশা নিবেদন করিতে না পারিলে আমাদের মুক্তির উপায় হইবে না ইহা ভাবিয়া প্রতিভাশালী বাগ্মী শ্রদ্ধেয় লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি দুই-এক জন ভোট সংগ্রহে উহার সভ্য হইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সেরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ কয়েকজন বিলাতে গিয়া আন্দোলন করিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল ফলিল না।

মহামতি লর্ড রিপণ মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে স্বদেশশাসনে আমাদিগকে কথঞ্চিৎ অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহারই সময়ে দেওয়ানী বিচারের ন্যায়, ফৌজদারী আদালতে ইংরাজ-ও-দেশীয়নির্ব্বিশেষে সকলের বিচারের ভার এদেশীয় লোকের হস্তে যাহাতে আইসে, তাহার জন্য মহামতি ইলবার্ট সাহেব একটি পাণ্ডুলিপি তদানীন্তন 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়' উপস্থিত করিলে সমগ্র ইংরাজমণ্ডলী একত্র হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। "Are we to be tried by the natives ?" এই কথা লইয়া ইংরাজ-ব্যবহারাজীবগণও দারুণ কলরব ও আন্দোলন, এবং দেশীয়গণের উপর বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার W. C. Bonerji, যিনি ইংরাজসমাজের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন,তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি এই সময় হইতে স্বদেশীয় আন্দোলনের শক্তিশালী পাণ্ডা হইয়া দাঁড়ান। ব্রান্সনপ্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারগণ—যাঁহারা ঐ পাণ্ডুলিপি লইয়া দেশীয়গণের উপর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন—দেশীয় অর্থী প্রত্যর্থী ও জমিদারগণ তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে তাঁহাদের হস্ত হইতে সমস্ত 'ব্রিফ' অর্থাৎ মোকর্দ্দমার কাগজ কাড়িয়া লন। ব্রান্সন সাহেবের হাইকোর্টে অসামান্য পসার ছিল। তিনি সমস্ত পসার হারাইয়া অপদস্থ হইয়া এদেশ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

পূর্ব্ব হইতে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছিল তাহার ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম সূচনা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের খ্যাতনামা বিভিন্ন মনস্বী ও স্বদেশভক্তগণ এই কংগ্রেসের সভ্যরূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষ অংশে কলিকাতা টাউনহলে। বঙ্গের অধিকাংশ শিক্ষিত জমিদার, এমন কি, দৃষ্টিশক্তিবিহীন সুশিক্ষিত বৃদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেককে ঐ অধিবেশনে উপস্থিত দেখিয়াছি। সার সুরেন্দ্র

নাথের আমলে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন বা ভিক্ষাপ্রার্থনা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আচরণ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে কেহই ভয়ে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। একটি দিনের কথা মনে পড়ে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন; টাউনহলে তাহার প্রতিবাদ-সভায় সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন টাউনহলের দোতলায় এবং প্রবীণ অম্বিকাচরণ মজুমদার নীচের তলায় যে নির্ভীক ও সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও স্মরণপথে মুদ্রিত রহিয়াছে।

অতঃপর লোকমান্য মহাত্মা তিলকপ্রমুখ যখন আসরে নামিলেন, তখন তাঁহাদের প্রচণ্ড মূর্ত্তিসন্দর্শনে তেজস্বী সুরেন্দ্রনাথও ভীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, সুরেন্দ্রনাথ আপনার দুর্দ্ধর্ষ প্রতিভার বলে যে আলোক এদেশে দিয়াছিলেন তাহা সমগ্র জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। সত্য কথা বলিতে গেলে ইনিই মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের আগমন সম্ভবপর করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উদারপ্রকৃতি জমিদার ও শিক্ষিতগণ মাত্রেই কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ও সভ্য ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রমাদ আশঙ্কা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। গবর্ণমেণ্টের অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দ কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির গতিবিধি অনুসন্ধান জন্য অসংখ্য ডিটেক্টিভের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল। এদিকে 'বিজাতীয় পণ্যদ্রব্য আর ব্যবহার করিব না' এইরূপ মন্তব্য সর্ব্বত্র গৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। এমন কি, দোকান হইতে যাহাতে কেহ উক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে না পারে তাহার জন্য যুবকগণ পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন। বিদেশীয় নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী গৃহ হইতে বাহির করিয়া এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ ক্রিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে বাধা দিতে গিয়া যুবকগণ দলে দলে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রতিদিন কারাগৃহে প্রেরিত হইতে লাগিল। অসংখ্য আগন্তুক পাইয়া কারাগার আর স্থান সঙ্কুলান করিতে পারিল না। অন্য দিকে অবিবেচক যুবকগণের হস্তে ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীগণ নিহত হইতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের সঙ্গীত হাটে বাজারে ও প্রশস্ত রাজপথে গীত হইতে লাগিল।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক যে, দেশের কল্যাণের দিক দিয়া রাজনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য এইরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছিল বটে, কিন্তু দেশের প্রতি যথার্থ ভালবাসার ভাব তখনও সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। উহা জাগিয়া উঠিল অনেকটা মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর ভিতর দিয়া। তিনি আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীকে আঘাত করিলেন, তাঁহার বিখ্যাত সঙ্গীতে—"বন্দে মাতরং, সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরং"। তিনি দেশাত্মবোধের ভাব আরও জাগাইলেন 'আনন্দ-মঠের' ভিতর দিয়া। পরে দেশপ্রীতির মধুরতর ভাব জাগাইলেন স্বর্গীয় ডি, এল, রায় তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী জাতীয় সঙ্গীতে এবং রবীন্দ্র নাথ তাঁহার সুনিপুণ ও সুমধুর অনুরূপ সঙ্গীত-ধারায়। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন শাখায় স্বাজাত্যভাবের বোধ জাগ্রত হয় নাই। ধর্ম্মে ও সংস্কারে বৈদেশিক ভাবকে ও বৈদেশিক প্রথাকে আদর্শ করিয়া বর্জ্জননীতির উপর ধর্ম্ম প্রচার চলিতেছিল। আপনার দেশ ও আপনার দেশের রীতি-নীতি উপেক্ষার সহিত পরিদৃষ্ট হইতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, সে ভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

সে যাহা হউক মতপার্থক্যগত বিবাদ ক্রমে ঘনায়িত হইতে আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্র বাবু অগ্রসরতর দলের অত্যুগ্র গতিতে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে ইহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেন। ক্রমে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। তাঁহার কথা অহিংসা-অসহযোগ-ব্রত। ইহার ভাবার্থ এই যে, গবর্ণমেণ্ট যখন তোমাদিগকে আনুকূল্য করিতেছেন না, তোমরাও কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে আনুকূল্য দান করিও না। স্বরাজ্য লাভের জন্য প্রয়াসী হও, কিন্তু হিংসা বা হত্যার ভিতর দিয়া নহে। অসহযোগ-ব্রতে ও হিংসামার্গ-পরিহারে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চরকা গ্রহণ কর। সর্ব্ববিধ বিলাতী পণ্য পরিবর্জ্জন কর। বিলাসহীন হও। সুতা প্রস্তুত কর, ঐ সুতায় বস্ত্রবয়ন করিয়া নিজের অভাব মোচন কর। ৬০।৬৫ ক্রোর টাকার বস্ত্র এদেশে প্রতিবর্ষে বিলাত হইতে আসে; যদি নিজের বস্ত্র নিজে বয়ন করিয়া লইতে পার, এই যে ৬০।৬৫ ক্রোর টাকা যাহা তোমার দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিবে। সে ধন তোমাদের দেশেই রহিয়া যাইবে। তুমি কাউন্সিলে সভ্যরূপে যাইতে পারিবে না। তাহাতেও গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা হয়।

গান্ধি মহাত্মার নিয়ন্তৃত্বে যখন চিত্তরঞ্জন কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন তখন হইতে, তিনি মহাত্মার দক্ষিণহস্তরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার অগাধ অর্থাগমের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তিরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কাউন্সিলে প্রবিষ্ট হইবার

পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধী তাহার বিরোধী প্রথম অবস্থায় থাকিলেও পরে চিত্তরঞ্জনের যুক্তি অনুমোদন করিলেন। চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করিলেন, আমরা সকলেই কি ভারতবর্ষীয় কি প্রাদেশিক ব্যবস্থা-সভায় প্রবিষ্ট হইব; কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবস্থা-সভাগুলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিব, গবর্ণমেন্টের অন্যায় কার্য্যের আদৌ সমর্থন করিব না। অন্যদিকে মহাত্মার অহিংসামূলক আদর্শে ও উপদেশে পুলিশ-হত্যা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থাসভা সত্য সত্যই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া অধিবেশন বন্ধ ছিল, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারও সাপ্র, মতিলাল নেহেরুপ্রমুখের বাগ্মীতায় প্রতিপদে গবর্ণমেন্টকে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইতেছে। অন্য অন্য প্রাদেশিক সভাতেও স্বরাজদলের অদম্য প্রতিপত্তি। আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইবে না ইহাই তাঁহাদের সত্যকার ধারণা। গবর্ণমেন্টকে বাধ্য করিয়া দেশের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইব ইহাই তাঁহাদের মত। ব্যবস্থাপক সভার বাদবিতণ্ডা ও সভাভঙ্গের বিবরণ ইংলণ্ডে পৌছিতেছে। মণ্টেগু-নীতি অকার্য্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের এই দারুণ সঙ্কটে বিলাতে ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। লাট সাহেব লর্ড রেডিং ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের পরামর্শ কারণ হঠাৎ বিলাতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেখা যাউক, কোন্ পথ ধরিয়া আমাদের সৌভাগ্যের সূচনা হয়।

অদম্য ছিল চিত্তরঞ্জনের শক্তি। হিন্দু-মুসলমানের একীকরণে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য। ধন্য তাঁহার স্বদেশপ্রেম। তাঁহারই আদর্শে তাঁহারই পরিচালনে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল। সকলকে টানিয়া আনিয়া নিজ মতে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা তাঁহাতে যেরূপ ছিল, অন্যের ভিতরে তাহা একেবারেই সুদুর্লভ। এত ত্যাগের ভাব, এত নির্ভীকতার ভাব অপরে আছে কি না জানি না। তর্কশক্তির এমন অজেয় পরাক্রম সত্যই অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি মহাত্মার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া যতটুকু করিয়া গেলেন, তাহা হইতে অধিক না হউক, ঐ পরিমাণ রক্ষিত হইলেও দেশ কল্যাণ লাভ করিবে, ইহাই সকলের আশা। বিনয় তাঁহার চরিত্রকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হস্তজাত খদ্দর দেশের অভিজাতবর্গের ও শিক্ষিতগণের ভূষণ হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী দ্রব্যের প্রতি উদাসীনতা মহাত্মা গান্ধী ও দেশরঞ্জনের সাধনের ফল, ইহা যেন সকলের মনে থাকে। অপূর্ব্ব তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল। আজ ২।৩ বৎসর ধরিয়া দেশপরিভ্রমণে জাগরণের মন্ত্র বিলাইয়া ও তাহার ফলে স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের শেষ রক্তটুকু পর্য্যন্ত দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়া গেলেন।

চিত্তরঞ্জন আপনার অসামান্য প্রতিভাবলে স্বরাজ-মন্ত্রের পরমশক্তিশালী নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, কি দানে, কি হৃদয়ের উচ্চতায়, কি তর্কশক্তিতে, কি হিন্দু-মুসলমানের একীকরণে, কি ত্যাগে, কি সত্যসাধনে, কি উদ্যমে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যিনি তাঁহার স্থান তুল্যরূপে অধিকার করিতে পারেন। তাঁহার তিরোভাব চির-দরিদ্র চির-অভিভাবকহীন ভারতবর্ষকে আরও যেন নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া গেল। ভগবানের আদেশে পরিশ্রান্ত চিত্তরঞ্জন চির বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। জানি না মঙ্গলময়ের বিধানে কে আবার দেশের নির্ভীক কাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইবেন? একদিকে সুরেন্দ্রনাথের অপর দিকে চিত্তরঞ্জনের বিয়োগে দেশের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, তাহাতে মুহ্যমান হইলে চলিবে না। তাঁহারা ব্যক্তিগত চেষ্টায় দেশের যে কার্য্য করিয়া গেলেন, সমবেত চেষ্টায় তাঁহাদের অসমাপ্ত সাধনায় সিদ্ধি আনয়ন করিতে হইবে, হিংসার পথ ধরিয়া নহে কিন্তু অসহযোগ ও বিরোধপরিহারের এবং মিলনের পথ ধরিয়া।

'রামপ্রসাদ'।*

'রামপ্রসাদ'—জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের আজ শুভদিন, বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। রামপ্রসাদ যুগমানবরূপে যুগবাণী আনয়ন করেন, যদিও তিনি সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে অল্পবিস্তর পাগল বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্মজগতে বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, রামমোহন, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ পাগল—পাগল অনেকে। কিন্তু এই সব যুগ-মানবেরাই জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের লোক নবজীবন লাভ করিয়াছে, নবশক্তিতে শক্তিমান হইয়াছে। প্রসাদের বাণী প্রেমের বাণী, ভক্তির বাণী; ইহা বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনের সাড়া। এই বাণীকে সফল করিবার একমাত্র উপায় জগজ্জননীর চরণে আত্মনিবেদন। বদ্ধজীবের মুক্তিসাধনের জন্য এই আকুল আকাঙ্ক্ষা, ইহারই ভাবে প্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই যুগ-বাণীতে বাংলার আপামর সকলেই নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। তিনি মা-নামের শঙ্খনাদে দেশের

* প্রাপ্তিস্থান ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা। গ্রন্থের আকার ডবল ক্রাউন ষোলপেজী; উৎকৃষ্ট অক্ষরে, ৯ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অতি উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই।

শুষ্ক খাতে জাহ্নবীর পবিত্র বারিধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

'রামপ্রসাদ'-গ্রন্থলেখক শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসাদের এই ভাবসাধনাকে নূতন সাজসজ্জায় সাজাইয়া আজ বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। ইহা তাঁহার বিংশতি বর্ষের সাধনার ফল। বাংলাদেশে প্রসাদজীবনী ও পদাবলী এ ভাবে পূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র বিক্রমপুরবাসী, তিনি প্রসাদকে উপলব্ধি করিবার জন্য যে ভাবে কুড়িটী বৎসর বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা দেশপূজ্য 'দেশবন্ধুর' জন্মভূমির জল, মাটী ও বায়ুর মহাশক্তির ফল। আশেপাশে মুক্ত আকাশ, বিশুদ্ধ বায়ু ও স্রোতস্বতীর সলিল পাইলে গাছপালা যেমন সতেজ, সবল ও সুস্থ অবস্থায় বাড়িয়া উঠে, শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের চারিপার্শ্বে এমন কতকগুলি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনিও প্রসাদের ভাবসাধনা প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রসাদের হৃদয়তন্ত্রী যে সুরে বাজিয়াছিল, তাহা বাংলার সুর—খাঁটি বাঙ্গালী কবির সুর। সে সুর কোঠা-বালাখানায় বাজে না,—বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায়, গোছা গোছা সবুজ ধানের মাঠে, গোচারণের ধূলিময় গ্রাম্যপথে, রাঙ্গা উষার রক্ত আভায় রঙ্গিলা কূলে-কূলে ভরা বাংলার নদীর জলে সেই সুর বাজে। সেই সুদূর অতীতকালে হালিসহরে গঙ্গাতীরে এই সুর বাজিয়াছিল। শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র ভগীরথের মত প্রসাদের সেই দেবদুর্ল্লভ সুরকে বাংলায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন। মাতৃমন্ত্রের আদিগুরু শক্তিসাধক প্রসাদের জয়গান করিয়া এই নবযুগে বাঙ্গালী আবার আত্মজ্ঞান-লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হউন। যোগীশ্বর প্রসাদের সরল পদাবলী অবলম্বনে বাঙ্গালীর কল্যাণ হইবে—জাতির মঙ্গল হইবে।

প্রসাদ-জীবনী ও পদাবলী জগতের অমূল্য রত্ন এবং জীবের জীবনপথের অতুল সম্বল। প্রসাদজীবনী শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের সিদ্ধহস্তের রচনায় সরল ও মনোজ্ঞ বাঙ্গালাভাষায় বিবৃত; এই পুণ্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সৌষ্ঠব বর্দ্ধন এবং বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকার পরম মঙ্গল সাধন করিবে, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। 'জীবনী' প্রসঙ্গের তন্ত্র-তত্ত্বের ভিতর দিয়া সাধকের জীবনী বিবৃত; এখানে গঙ্গা ও যমুনার মত তন্ত্র ও পদাবলীর শুভ সম্মিলন হইয়াছে। এই পুণ্যকাহিনী বর্ণনায় ভাষার আবরণে ভাব ঢাকিয়া পড়ে নাই; স্রোতস্বিনীর নির্ম্মল সলিলের মত কুলুকুলু স্বরে গাহিয়া চলিয়াছে। এই জীবনী-কথা পদাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত, পদাবলীর ভিতরকার ভাব লইয়া এই জীবনী রচিত। এ ভাবে প্রসাদ জীবনী রচনা করিতে যে আর একটী একনিষ্ঠ ভক্তের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা আমাদের বলা বাহুল্য। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রসাদজীবনী আমরা বাংলা সাহিত্যে আর দেখি নাই। বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট সবিনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন একবার নয় শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিরাট গ্রন্থখানা পড়িয়া দেখেন। ইহা গীতা ও চণ্ডীর ন্যায় বাংলার গৃহে-গৃহে সুরক্ষিত ও অধীত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। এখানে ভাষার একটু নমুনা দিতেছি,—

"গঙ্গাতীর হইতে অল্প কিছু দূরে পঞ্চবটীর ছায়ায় যোগাসনে বসিয়া সাধক সংসারের সীমার বাহিরে এক উন্নততর মহিমময় ভাবরাজ্যের সহিত আত্মার সম্মিলন করিয়া, চিরমধুর চিরনবীন কালীনামরূপ প্রেমসাগরে ডুবিয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিতেছিলেন,—

মন করো না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী ॥

আমি বেদাগম-পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী-কৃষ্ণ শিব-রাম সকল আমার এলোকেশী ॥

"আনন্দের আবেগে সাধকের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, গান থামিল। তখন তাঁহার পলকহীন নয়ন হইতে দর্ দর্ ধারে আনন্দের ধারা ধরায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সাধক আনন্দময়ী মায়ের ধ্যানে আত্মসমাহিত; তিনি দেখিলেন মায়ের কত শক্তি, কত গুণ, কত মহিমা, কত ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার উদার হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির যতটুকু ধারণা এবং রসস্বরূপিণী আনন্দময়ীর যতটুকু আনন্দ বিরাজমান তাহাই নানা প্রকারে, নানা আকারে, বিশ্বসৌন্দর্য্যে বিকশিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি হৃদয়মধ্যে শিববলয়িতা আদ্যাশক্তির আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মতৃপ্ত, তাই অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধক পুনরায় হেমময়ী আনন্দময়ীর আনন্দঘন লীলামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া মাতৃস্ত-সুধারস পান করিতে করিতে মাতৃরসে মজিয়া ও আত্মহারা হইয়া মৃদুমধুর স্বরে গাহিলেন,—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলি ॥

আমি যে-ভাবে সে-ভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।

* * *

ইনি কে? ঐ যে ভাবরূপিণী আনন্দময়ীকে মাতৃরূপে প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে ধ্যান করিয়া জগজ্জননী

দয়াময়ী মহাকালীর নামামৃত পানে বিভোর হইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে মুণ্ডমালীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়া দেবদুর্লভ দিব্যকণ্ঠে গান গাহিলেন; যাঁহার সেই সমুচ্চ মা মা ধ্বনিতে সুরের অলৌকিক আকর্ষণে সমগ্র সংসার যেন নামময় হইয়া উঠিল, ইনি কে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন জীব বড়ই দুর্লভ যে চক্ষু বুজিলেই তাঁহার মানসদর্পণে মায়ের মোহিনী প্রতিমা প্রতিফলিত হয়, অন্তরে ও বাহিরে তিনি মাকে প্রত্যক্ষ করেন। এ বড় সহজ কথা নয়; এ ব্যাপার অন্য কেহই কিছু বুঝিতে পারিবেন না, কেবল বুঝিবেন তাঁহারাই যাঁহারা সকল ছাড়িয়া, পার্থিব ধন-যশ-মান ও নামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মায়ের স্বরূপ জানিতে চান, চিন্ময়ী মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে চান। যাঁহারা জগদম্বার রাঙ্গা চরণে আত্মনিবেদন জানাইয়া সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহারাই শুধু জগদম্বার মহাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোমলকরুণ মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কারে বলিতে পারেন—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি।

এমন ভক্ত এমন শ্রেষ্ঠ সাধকের কামনাশূন্য হৃদয়ের গভীর আকর্ষণেই ভক্তবৎসলা ভগবতী সময়ে সময়ে অসম্পৃক্ত ও নির্ব্বিকল্প ভাবের ভিতর দিয়া সংসারে প্রকাশিতা হন। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, তৃষিত চাতকের মত তাঁহাকে কাতর প্রাণে ডাকিলে, একান্তনির্ভর হৃদয়ে কাঁদিলে, হৃদয় খুলিয়া অন্তস্তল উদ্ভিন্ন করিয়া দয়াময়ী মাকে ডাকিলে সন্তানবৎসলা জননী কি আর স্থির থাকিতে পারেন? অমনি তাঁহার করুণারূপ অমৃতনির্ঝরিণী হইতে প্রেম-ভক্তিসলিলের পুণ্যধারা সাধক ও ভক্তের হৃদয়ে ছাপিয়া উঠে। তখন সাধকের সমস্ত বাসনার শেষ হয় এবং তৃষ্ণা মিটিয়া যায়।

"আজ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সোনার বাংলার হালিসহরে এমন একজন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার মাতৃভাবসাধনার প্রবল আকর্ষণে জগদম্বাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তিনি বিশ্বের আদিজননীকে মাতৃভাবের মাঙ্গল্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, যে মাতৃভাব জীবের অস্তিত্বের মূল হইতে মন-প্রাণ ও অন্তরাত্মায় ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, ভাবস্বরূপিণী ত্রিজগতের জননী ভগবতীকে পাইবার জন্য সেই শ্রেষ্ঠ ভাবই জীবের সহজসাধ্য সাধনা এবং ইহাই প্রাকৃতিক পন্থা—মাতৃভক্তির অভ্যন্তরে এই মহিমময় ধর্ম্মভাবের সন্ধান দিয়া বাংলাদেশে আত্মতত্ত্ব ও কালীতত্ত্বের এক অভিনব ভাবস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তিনিই সেই জগদম্বার মানসপুত্র ভক্তচূড়ামণি "শ্রীরামপ্রসাদ।"

'প্রসাদী-কথায়' গ্রন্থকারের মৌলিক প্রবন্ধ 'প্রসাদী-রচনায় শাস্ত্রের প্রভাব', 'দ্বিজ রামপ্রসাদ', 'প্রসাদের কালী-কৃষ্ণ-তত্ত্ব', 'রামপ্রসাদের ভাবসাধনা', 'প্রসাদের মাতৃভাব', 'আত্মজ্ঞান', 'ভগভক্তি', 'সঙ্গীতে প্রসাদের অবস্থা পরিচয়', 'প্রসাদের ষটচক্রসাধনা', 'প্রসাদ-বংশাবলী'. 'নিধিরামের বংশাবলী' 'কবিরঞ্জন উপাধি ও বিদ্যাসুন্দর', 'কালীকীর্ত্তনে', 'রাজকিশোর', 'প্রসাদের মুহুরিগিরি', 'রামপ্রসাদের রসভঙ্গ', 'প্রসাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কালনির্ণয়' 'প্রসাদের ধর্ম্মমত', প্রভৃতি রচনায় প্রসাদীতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। এই প্রকার বহুগবেষণাপূর্ণ রচনা প্রসাদপ্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্ব্বে আর পড়ি নাই। ইহার ভিতরে প্রমাণ-প্রয়োগ ও সারবান্ যুক্তির অভাব নাই। এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' গুপ্ত-কবির "কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন" প্রবন্ধ ৭২ বৎসর পর পুনর্মুদ্রিত হইল। গুপ্ত কবির এই প্রবন্ধ অতি উপাদেয় নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। এই প্রবন্ধের অনুসন্ধানে গ্রন্থকার যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক আগ্রহ ভিন্ন এই লুপ্তরত্ন উদ্ধার হইত কি না সন্দেহ।

প্রসাদ-বংশের ইতিহাসসংগ্রহ এবং প্রসাদের জন্ম-মৃত্যু-তারিখ নিরূপণ প্রবন্ধ এই গ্রন্থের একটী অপূর্ব্ব বস্তু। প্রসাদবংশকে বাঙ্গালী ভুলিয়াছিল; বড়ই সুখের বিষয়, গ্রন্থকার সেই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া একটী মহাকীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন। আর একটী বিশেষত্ব এই যে, প্রসাদের বৈমাত্রেয় ভাই নিধিরামের বংশাবলীর ইতিবৃত্ত এই প্রথমে প্রচারিত হইল। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে তাঁহার ক্ষেত্র, বীজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রন্থকার প্রসাদের ও প্রসাদবংশের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের নিকষ-রেখা যথাশক্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। এ ভাবে প্রসাদতত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তারপর "প্রসাদপ্রসঙ্গ"-লেখক কুমিল্লানিবাসী উদার ব্রাহ্ম ৺দয়াল ঘোষের সুন্দর একটী জীবনী এই বিরাট গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আমরা বলিতে বাধ্য যে, দয়াল ঘোষের জীবনী-কথা বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থকার বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। 'শিবসুন্দর', 'প্রসাদের বাস্তভিটা', "পঞ্চমুণ্ডী আসন", "শিবের গলির গঙ্গাদৃশ্য" প্রভৃতি চিত্রে এই গ্রন্থ সুশোভিত। গ্রন্থকার হালিসহরে গিয়া এই সকল চিত্র তুলিয়াছেন। ব্লকগুলি নিখুঁত ও সুন্দর হইয়াছে।

প্রসাদের ধর্ম্মমত তাঁহার পদাবলীর ভিতরই পরিস্ফুট।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'শ্রীরামপ্রসাদের পদাবলীর অনুপম ভক্তির সরসতার পশ্চাতে একটা বিরাট জ্ঞান ছিল, এবং সেই জ্ঞানের পশ্চাতে একটা মহাজ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। এই মহাজ্ঞানই যোগতত্ত্ব। সকাম বা নিষ্কাম উভয়বিধ সাধনার জন্যই যোগের আবশ্যক। শুধু ভাষাতে ব্রহ্মভাব জীবের হৃদয়ে আসিতে পারে, কিন্তু ভক্তির সঙ্গে যদি জ্ঞান ও যোগের সম্মিলন হয় তবেই ভক্তের ইষ্টদেবতা তাঁহার নিত্যসঙ্গী হন। প্রসাদের ভক্তিশতদল জ্ঞানকে শিরে রাখিয়া কালীনাম ও রূপের ভিতরে জীবন্ত ও সরস হইয়া যোগতত্ত্বে বিকাশলাভ করিয়াছিল। এই কারণে গুণী শ্রোতা প্রসাদের মধুর পদাবলীর ভিতর এক-একটী নূতন তত্ত্বের ও তথ্যের সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।" এ কথাগুলি বড় খাঁটি।

তন্ত্র ও উপনিষদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থকার পদাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কাগজ ও অর্থের অভাবে বর্ত্তমানে পদাবলীর পাদটীকার (বিশেষ বিশেষ পদাবলী ছাড়া) ব্যাখ্যাগুলি দিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার নিবেদনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "ইচ্ছা আছে মাতৃভক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য পাইলে "প্রসাদীপদাবলীর ব্যাখ্যা" নামে অন্য একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিব। তবে আমার প্রাণের এই সাধ কখন্ যে পূর্ণ হইবে তাহা মা জগদম্বাই জানেন; কারণ বর্ত্তমানে আমার আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, আমি নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ কাজ শেষ করিব এমন শক্তি আমার নাই। কোন মাতৃভক্ত পাণ্ডুলিপির মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিলে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইব"। এবিষয়ে আমরা সদাশয় ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা এই পাণ্ডুলিপিখানা ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করা হইবে। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, এই কাজটী সম্পন্ন করিতে বাংলা দেশে মুক্তহস্ত ধনীর অভাব হইবে না।

গ্রন্থকার শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিংশতি বর্ষের সাধনার ফলে এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। সম্প্রতি তাঁহার রচিত 'সাধক কমলাকান্ত' গ্রন্থও ছাপা শেষ হইয়াছে, সত্বরই উহা প্রকাশিত হইবে। এই দুইখানা গ্রন্থের ভিতর তাঁহার সাধকদের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে শ্রীমানের দেহভঙ্গ হইয়াছে, বাত ও অজীর্ণ রোগে তিনি কঙ্কালসার হইয়াছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত নিয়ত লড়াই করিয়া তিনি যে আজ বাংলা সাহিত্যকে এই বিরাট দুইখানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অধিক আর বলিবার কিছুই নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত দেশ-হিতৈষণা ও বাঙ্গালী প্রীতির কার্য্য করিয়াছেন। উপসংহারে পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ করুন ইহাই প্রার্থনা।

কুড়ান গান।

(মহেন্দ্র ক্ষেপা)

ভৈরবী।

আমার মন! কররে কেন মিছে ভাবনা,
মরণ-কালে সঙ্গে দিবে ছেঁড়া চেটা বিছানা।
গয়া যাও আর কাশী যাও,
মথুরাতে পাবি না—
দেখ্ তোর্ হৃদমাঝারে বিরাজ করে
তারেও চিন্‌তে পার না।
একতারেতে তার মিশারে তারেও কেন ডাক না?
পাঁচ তারেতে তার মিশালে হরির দর্শন পাবে না।
যারে বল আপন আপন সঙ্গেতে কেউ যাবে না,
মরণ-কালে তোমাকে কেউ এক গণ্ডূষ জল দিবে না।

রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর পরলোকে।

বর্ত্তমান-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় এই শোক-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, মহারাষ্ট্রকুলতিলক স্বনামধন্য ডাক্তার স্যার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় গত ৮ই ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণে তাঁহার পুণানগরীর বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে আশ্রয় প্রদান ও শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনা বিধান করুন।

ভ্রমসংশোধন।

গত শ্রাবণ-সংখ্যায় শোক-সংবাদের মধ্যে (১৬২ পৃঃ) 'ফণীন্দ্রনাথের' স্থলে 'ফণিভূষণ' এবং 'স্বীয় বাসভবন ৫৪নং হাজরা রোড' স্থলে 'মাতৃ-সকাশে ৩নং সানিপার্ক' হইবে। গার্হস্থ্য-সংবাদে 'অজিতকুমার' স্থলে 'অজিত-নাথ' হইবে।

বটকৃষ্ট পালের
এড্‌ওয়ার্ডস্‌ টনিক জাল।

গত ২৪শে জুলাই কলিকাতার ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্‌ পুলিসকোর্টের এডিসন্যাল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দে মহাশয় বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোংর এড্‌ওয়ার্ডস্‌ টনিক জালের মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ আসামী হীরালাল পাল ও জ্যোতিলাল পাল কলিকাতার ৮নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট্‌ হইতে তাহাদের কর্ম্মচারী কামিনীমোহন রায় মারফতে ৭ ব্যাক্স জাল টনিক ঢাকার উপেন্দ্রনাথ সাহার নামে পাঠাইয়াছিল। উক্ত ৭ ব্যাক্স জাল টনিক ঢাকা হইতে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সার্চ্চ অর্ডার মত ধরিয়া কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। তাহাদের কর্ম্মচারী কামিনী রায় অদ্যাবধি ফেরার। সাক্ষীগণের এজাহারে আরও প্রকাশ পায় যে উক্ত আসামীদ্বয় অন্যান্য স্থানেও জাল টনিক বিক্রয় করিয়াছিল। বিচারে আসামীগণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রত্যেকের ২০০৲ টাকা হিসাবে জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আসামীদ্বয়কে ২ মাস করিয়া সশ্রম কারাবাস করিতে হইবে। জাল টনিক গুলি নষ্ট করিবার আদেশ হইয়াছে।



ছেলেমেয়েদের জন্য
শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত

রত্নদ্বীপ

প্রাইজের জন্য বাংলার ডিরেক্টার-অনুমোদিত

গল্পের বই

মূল্য দশ আনা

Stevenson এর বিখ্যাত Treasure Island গল্প অবলম্বনে লিখিত। একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবহুল কাহিনী। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

ছাপা ও কাগজ সুন্দর। মলাটে রঙিন চিত্র।

Parts Of Speech

প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য গল্পচ্ছলে নূতন পদ্ধতিতে লিখিত ও বহু হেড মাষ্টার কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

মূল্য চারি আনা।

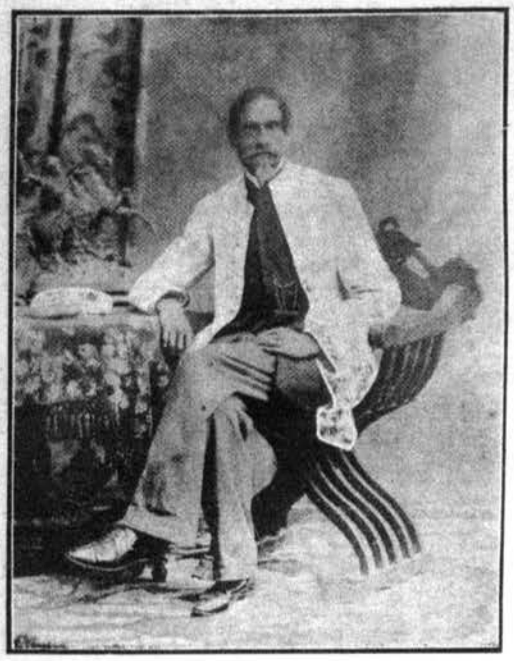
The attempt…is an ingenious one is likely to be of great use in teaching English Grammer to beginners,

Principal Herambachandra Maitra, M. A.
City College, Calcutta.

"Entirely novel in its plain...cannot fail to attract and interest our boys…will do a great deel of good to them,"

Manilal Sanyal M. A, B. SC,
Hd, master, Giridhi High English School.

প্রাপ্তিস্থান :—সন্দেশ কার্য্যালয়—৭২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত সুধাবিন্দু বিশ্বাস, ২১।১৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায়, বারগণ্ডা, গিরিডি; কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং ঢাকার রুটন ও এলবার্ট লাইব্রেরী।



৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(বিলাত হইতে প্রত্যাগমনে)



শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী



৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর



৺মনোমোহন ঘোষ (যৌবনে)

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সৌজন্যে)

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮৬ সংখ্যা | ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬৫। অঞ্জলি—সত্যং জ্ঞানমনন্তং দেবতা।

১। হে অগ্রণী, হে পথপ্রদর্শক! তুমি অক্ষয় অমৃত পুরুষ। লোকলোকান্ত তোমারই আদেশে এক অক্ষয় প্রেমসূত্রে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। আজ এই পবিত্র সুনির্ম্মল উষাকালে তুমি আমাদিগকে ঐ সূর্য্যালোকে লইয়া যাও, যাহাতে আমরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টির তত্ত্ব অবগত হইয়া জগত হইতে আধিব্যাধি নির্ম্মূল করিতে পারি। আমরা আজ সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভে এখানে তোমার নামযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি, তুমি সমস্ত দেবমনুষ্যকে জাগাইয়া দিয়া আমাদের এই সভায় প্রেরণ কর।

২। তুমি আমাদের সেনাপতি, তুমি আমাদের নেতা। তোমার আদেশ আমরা নিত্য অবিচলিত চিত্তে বহন করিব। তোমার আদেশে আমরা যখন কর্ম্মরথে আরোহণ করিব, তুমিই ন সেই রথকে পরিচালিত করিও। আমাদের ।ই কর্ম্মযজ্ঞ হইতে শৌর্য্য বীর্য্য তেজ ও ধন সমুত্থিত হউক, আমাদিগকে তোমার নামে গৌরব করিবার অধিকার প্রদান কর।

৩। তোমার আদেশে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র মেঘবায়ু সকলেই নিত্য তোমার নিকট হইতে শুভসম্বাদসকল বহন করিয়া আনিতেছে। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে তোমার প্রেম সেতুস্বরূপ থাকিয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই পবিত্র উষাকালে ভক্তেরা তোমার আরতি করিতেছে। তোমার স্বপ্রকাশ জ্যোতি প্রভাতের লঘু মেঘের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। তোমাকে নমস্কার করিয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই।

৪। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি চিরপুরাতন, কিন্তু চিরনবীন। আজ তুমি আমাদের যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিস্বরূপে আসিয়াছ। আমরা তোমাকে কোন্ দ্রব্যের দ্বারা বরণ করিব জানি না। আমরা তোমার সন্তান। আমরা তোমার চরণে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, তুমি তাহা স্নেহহস্তে গ্রহণ কর এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আজ এই প্রভাতে তোমার চরণপূজা সমাপন করিয়া বিশ্বজগতের অধিবাসী দেবমনুষ্য সকলকেই আমাদের এই যজ্ঞে আহ্বান করিব।

৫। তুমি জন্মরহিত। তুমি অজর, অমর, অক্ষয়। তুমিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। তুমিই এই জগতের পালক ও নিয়ন্তা। সমস্ত শুভ কর্ম্মের সমস্ত মঙ্গলভাবের একমাত্র মূল উৎস তুমিই। তোমারই আদেশে বিশ্বজগতের কর্ম্মযজ্ঞ অনুসৃত হইয়াছে। মৃত্যুও তোমার আদেশ অতিক্রম করিতে পারে না। মৃত্যু তোমারই মঙ্গল আদেশ বহন করিয়া আনে মাত্র।

আমাদের সকল চিন্তা, সকল কর্ম্ম তোমাতেই পরিসমাপ্ত হউক। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৬। হে আনন্দস্বরূপ! তোমারই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্বজগত আজ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা তোমাকে ভজনা করি। তুমি আমাদিগকে তোমার অপার আনন্দসাগরে একবার প্রাণ ভরিয়া অবগাহন করিতে দাও। আমরা যাহাতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার নাম প্রচার করিয়া জগতকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারি, তোমার নিকটে সেই কারণে দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে আয়ু, বল ও বীর্য্য প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর।

৭। তোমারই মঙ্গল নিয়মে সংসারে কর্ম্মযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমারই প্রেরিত জ্ঞান আমাদের অন্তরে আসিয়া নীরবে বিশ্বজগতের সম্বাদ জানাইয়া দিতেছে। এ সমস্ত তোমারই মহিমা—ইহা তোমারই মহিমা। তুমি আমাদের এই যজ্ঞে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন কর।

৮। হে সুন্দর পুরুষ! প্রভাতের অরুণোদয়ের ভিতর দিয়া যে অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রেরণ করিতেছ, সে সৌন্দর্য্য সহ্য করিবার ক্ষমতা আমাদের অন্তরে প্রেরণ কর। তুমি আমাদিগকে অন্নজলের অভাব হইতে মুক্ত কর, যাহাতে তোমার আনন্দ তোমার সৌন্দর্য্য আমরা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি।

৯। হে পরমপুরুষ! তোমার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলনিয়মে এই ব্রহ্মচক্র বিধৃত হইয়া আছে। তুমিই কর্ম্মযজ্ঞের প্রবর্ত্তক। তুমিই এই বিশ্বজগতের পালক। আমাদের সমস্ত মঙ্গলভাবের, সমস্ত শুভ কর্ম্মের মূল উৎস তুমি। তুমিই আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া মঙ্গল চিন্তা ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রতিদিন প্রভাতে মেঘমুক্ত আকাশে অরুণতপনকে প্রেরণ কর। আমরা তোমার পবিত্র নাম লইবার অধিকার পাইয়া কৃতার্থ হই।

১০। হে জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বর! তুমিই আমাদের একমাত্র সম্ভজনীয়। পবিত্র উষাকালে অরুণতপনের ভিতর দিয়া তোমারই স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত কর। তুমিই আমাদের রক্ষক। তুমিই আমাদের মঙ্গলবিধাতা। তুমিই অসংখ্য জীবজন্তুর উৎপত্তির মূল কারণ হইয়াও জন্মরহিত পরমাত্মা।

১১। তোমারই করুণায় আমরা কর্ম্মযজ্ঞের সমস্ত উপকরণ পাইতেছি। তুমিই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে আমাদিগকে তোমারই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত করিয়াছ। তুমি অনন্তজ্ঞানস্বরূপ। তোমার জ্ঞানের একবিন্দু লাভ করিয়া বিশ্বজগত অনন্তজ্ঞান তোমাকে লাভ করিবার পথে চলিয়াছে। সংশয়বাদী ও অশ্রদ্ধাবানদিগের হৃদয় হইতে সংশয় ও অশ্রদ্ধা সমূলে উৎপাটিত করিয়া দাও। তোমারই আদেশে জল মধুক্ষরণ করিতেছে; সমস্ত প্রকৃতি মধু বহন করিয়া আনিতেছে। আমরা আমাদের সকল কর্ম্মে তোমাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

১২। তোমার ভক্তদিগের যোগক্ষেম তুমিই বহন কর। তোমার ভক্তদিগের কর্ম্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা তুমিই কর; তুমিই তাহাদিগের মঙ্গলবিধান কর। এই জন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মগর্জ্জন ভেদ করিয়া তোমার দয়াময় নাম অহর্নিশি ধ্বনিত হইতেছে। তোমার করুণা অজস্রধারে বর্ষিত হইয়া তোমার প্রবর্ত্তিত সংসারকে সিক্ত রাখিয়াছে।

১৩। এই প্রভাতে আমরা সুললিত তানে তোমার আরতি করিতেছি। তুমি তাহা স্নেহ প্রকাশে শ্রবণ কর। আমাদের অতিথিগণের আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হউক।

১৪। তুমি আমাদিগকে দানশীল কর। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের বংশে বংশানুক্রমে দাতার অভাব না হয়। তুমি আমাদিগকে তেজস্বী কর। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের বংশে তেজস্বী পুরুষের কখনও অভাব না হয়। তুমি আমাদিগকে কর্ম্মশীল কর। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের বংশে কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠাতার কখনও অভাব না ঘটে। এই উষাকালে আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর এবং আমাদের সেই প্রার্থনা সফল কর।

৬৬। অঞ্জলি—কর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা।

১। আমাদের এই কর্ম্মযজ্ঞে য়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা পৃথিবীর সকল দেশেরই লোক যোগ দিয়াছে, তুমি তাহাদের সকলেরই মঙ্গলবিধান কর। ভারতের সকল বিভাগের লোক মিলিত হইয়া এই কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে এবং এসিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের লোক এই অনুষ্ঠানে প্রভূত সহায়তা করিতেছে। তুমি এই কর্ম্মযজ্ঞকে সুসম্পন্ন কর।

২। তোমার হস্তে ফলাফলের ভার অর্পণ করিয়া আমরা আমাদের সকলের মিলনকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া চলিতেছি। তুমি আমাদের অন্তর হইতে বৈরীভাব দূর করিয়া তাহার স্থানে মৈত্রীভাবকে সংস্থাপিত কর।

৩। তুমি কর্ম্মযজ্ঞের প্রবর্ত্তক। যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই দিকে তোমারই কর্ম্মের পরিচয় পাই। তুমিই বিশ্বকর্ম্মা। তোমারই আদেশে আমরা চারিদিকে শতবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি। তুমি আমাদের অন্তর-বাহির সকলই দেখিতেছ। তুমি আমাদের প্রার্থনা সকলই শুনি-তেছ। আমাদের প্রার্থনা সফল কর এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

৪। কর্ম্মযজ্ঞের দ্বারা আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ হইলে পর তোমার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সেখানে স্বপ্রকাশ হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ম্মযজ্ঞের ভিতর দিয়াই সংসারে তোমাকে আনয়ন করিয়া-ছিলেন।

৫। আমরা যে সকল সুশ্রাব্য গানের দ্বারা আমাদের এই কর্ম্মযজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করি-তেছি, তুমি দেবগণের সহিত এখানে আসিয়া সেই সকল গান শ্রবণ কর ও তৃপ্তিলাভ কর। আমাদের কর্ম্মযজ্ঞ সার্থক হউক।

৬। হে বিশ্বপতি! তুমিই আমাদের একমাত্র প্রিয়। তুমিই আমাদের অন্নদাতা। জগতে তুমি আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর ধনধান্য দিয়া রাখিয়াছ। তোমার আদেশ লইয়া তোমার পথে চলিলেই তাহা আমাদের হস্তগত হয়। সূর্য্য ও চন্দ্র তোমার মস্তকস্থ মুকুটে থাকিয়া তোমার প্রজাদিগকে আলোক প্রদান করিতেছে। নিশার অন্ধকারে তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশদামের ভিতর হইতে কোটী কোটী গ্রহনক্ষত্র আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করে।

৭। হে অগ্রণী! তুমি আমাদিগকে মঙ্গল উদ্দেশ্যে এই কর্ম্মযজ্ঞে আনয়ন করিয়াছ। তুমিই কর্ম্মযজ্ঞের ফলদাতা। তুমিই তোমার প্রত্যেক প্রজার প্রয়োজন জানিয়া যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান কর। আমাদের অন্তরের প্রার্থনা তুমি শ্রবণ কর, তাহা আমরা জানিয়াছি। বিশ্ববাসী দেবমনুষ্য হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরে তুমি অধিষ্ঠিত আছ এবং সকলেই তোমার মহিমা নিত্য কীর্ত্তন করিতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত আমরাও তোমাকে আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছি।

৮। তুমি ভূমা। তোমার প্রভাব অতুলনীয়। আমরা তোমার নিকট আমাদের নিজের মঙ্গল কামনা করিতেছি; আমাদের পরিবারের মঙ্গল কামনা করিতেছি; আমাদের দেশের এবং এই বিশ্বসংসারের মঙ্গল কামনা করিতেছি। তুমি আমাদের এই প্রার্থনা সফল কর।

৯। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা ভয়ে অভিভূত, তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আশ্রয় লইতে ধাবিত হয়। সবলের নিকট তুমি স্বপ্রকাশ। হে মহাবল! তুমি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে তোমারই অধীনে থাকিবার উপযুক্ত বল-বিধান কর। দুর্ব্বল ব্যক্তি জানে না যে, কর্ম্মযজ্ঞের সমস্ত ফল একমাত্র তোমারই আদেশ অপেক্ষা করে। একমাত্র তোমাতেই আমরা স্থিতি করি-তেছি। আজ এই মঙ্গল প্রভাতে আমরা তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আহ্বান করিতেছি। তুমি তোমার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আসিয়া সুমার্জ্জিত পবিত্র স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের নয়ন সার্থক কর।

১০। আজ তুমি আমাদের হৃদয়ে আসিয়াছ। আমাদের অন্তর হইতে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি সমুদয় পঙ্কিল ভাব বিধৌত হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা জগতের ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল অধিবাসীর সহিত একপ্রাণে তোমার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। হে

অমৃতের পুত্রসকল! তোমরা যে যেখানে আছ, আজ আমাদের এই কর্ম্মযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আমাদের এই পরম উপাদেয় অর্চ্চনায় যোগদান কর।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

মিশ্র বেহাগ—দাদ্‌রা।

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না, তুমি এস।
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না, তুমি এস।
জীবন যখন হবে মরু
রইবে না তায় একটি তরু
যখন অন্ধ কারা ঠেক্‌বে ধরা তুমি এস।

কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে, তুমি এস।
বিফল যখন লাগ্‌বে জীবন মাগবে মরণ, তুমি এস।
ওগো নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে
সুধার উৎস ছুটিয়ো ভবে
আমার কান্না-জলে পান্না-দোলায় তুমি এস।

তুমি আমার জীবনে কি
কইতে আমি পারি সে কি
সব গীতি যে বন্ধ সেথায় সব উপমা মিথ্যে মেকি।

তুমি আমার জীবনে কি
তুমি বিনে জান্‌বে কে কি
ওগো তোমার চরণতলে সব বিকান্থ তুমি এস॥

ভারতের মিলনসাধনে জাতীয় পরিচ্ছদ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতের মিলনসাধনে, অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের পরস্পরের মুখের নহে, প্রকৃত আন্তরিক মিলনসাধনে ভাষার ঐক্য যেমন এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে, সেইরূপ পরিচ্ছদের ঐক্যও যে এক বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তুমি বাঙ্গালী—তুমি ধুতি-চাদর পরিয়া ... পাণ যেন মলয়বায়ুর সঙ্গে তালে তালে উড়িয়া চলিয়াছে; তোমার মনের সমস্ত ভাব যেন স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির সঙ্গে মিশিয়া চলিয়াছে। আর একটী বাঙ্গালী তাঁহার বিদেশী বন্ধু ইউরোপীয়ের সাজে হ্যাট বুট প্যাণ্ট-কোট পরিধান করিয়া মুখ হইতে বারে বারে ধুম উদ্গার করিতে করিতে চলিয়াছেন—তাঁহার চরণ ও চলনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যেন, তিনি ভারতবর্ষকে সমুদয় ইউরোপ দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে চান। তাঁহারা "বিলাতি ধরণে হাসেন আর ফরাসি ধরণে কাশেন; তাঁহারা পা ফাঁক করে সিগারেট থেতে বড্ডই ভালবাসেন"। এই সাহেবী বাঙ্গালীকে তুমি বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতেই পারিলে না; আর তোমাকে, বাঙ্গালী বলিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলেও তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক চিনিলেন না, পাছে তিনি নিজেও বাঙ্গালী বলিয়া ধরা পড়েন! তিনি যখন তোমার পার্শ্বে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডল অমানিশার মসীলিপ্ত হইলেও তুমি হয়তো তাঁহাকে কোন ইংরাজের বংশাবতংস ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলে, কথা কহিতেই সাহস করিলে না। এইখানে পরস্পরের কথাবার্ত্তায়, ভাবের আদানপ্রদানের সম্ভাবনাই তো বিলুপ্ত হইল, মিলনের কথা উঠিবে কিপ্রকারে?

পরিচ্ছদের বিভিন্নতা যেমন পরস্পরের পার্থক্যসাধনে সহায়তা করে, পরিচ্ছদের ঐক্য তেমনি পরস্পরের ঐক্যসাধনে যথেষ্টই সহায়তা করে। এই যে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল অংশেরই অধিবাসী সাধারণত ধুতি-চাদর বা কেবল ধুতি ব্যবহার করে; এই যে ভারতের রমণীগণ সাধারণত সাড়ী-ওড়না বা কেবল সাড়ী ব্যবহার করে, ইহা দ্বারাই তো বলিতে গেলে আমরা পরস্পরকে ভারতবাসী বলিয়া চিনিয়া লই এবং পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ও প্রাণের বিনিময় করিতে উৎসুক হই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমানে পরিচ্ছদের বিভিন্নতার কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীগণের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের যে পরদা পড়িয়াছে, পরিচ্ছদের ঐক্য সাধিত হইলে সেই পরদা অপসারিত হইবে নিঃসন্দেহ।

এ কথা বলিলে চলিবে না যে, প্রথমে ভাষা—

ঐক্য সাধিত হৌক, কঙ্গ্রেসে মিলন স্থাপিত হৌক, পরে পরিচ্ছদের ঐক্যসাধনে হস্তক্ষেপ কর। ইহা বালকোচিত কথা যে, ভাষার বা অন্যান্য বিষয়ে ঐক্য না হইলে পরিচ্ছদের ঐক্যসাধনে হস্তক্ষেপ করিও না। ভারতবাসীর প্রকৃত মিলনসাধন ইচ্ছা করিলে এক-এক সময়ে এক-একটী দিক ধরিয়া ঐক্যসাধনের চেষ্টা করিয়া নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। যত দিক দিয়া এবং যে দিক দিয়া সম্ভব, তত দিক দিয়া এবং সেই দিক দিয়া সমবেত-ভাবে বা পৃথকভাবে ঐক্য সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এই ঐক্যসাধনের অনুকূল আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কিপ্রকার হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত পরিচ্ছদের প্রয়োজন ও উপযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিলে ভাল হয়। আমাদের বিবেচনায় আত্মরক্ষা-রূপ সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত বা স্বত-অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আত্মরক্ষা মানুষের সর্ব্বপ্রধান স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। সকল জীবজন্তুর ন্যায় মানুষেরও ইহা অন্তর্নিহিত সাধারণ স্বাভাবিক ভাব। আত্মরক্ষার চেষ্টা না থাকিলে মানুষ দাঁড়াইতেই পারিত না। আদিম অবস্থায় বৃহৎকায় শতবিধ ভীষণ জানোয়ার-দিগের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ পাখীদের মত গগনস্পর্শী গাছের উপর বাসা বাঁধিয়া থাকিত দেখা যায়। আফ্রিকাখণ্ডে এখনও এই জাতীয় মানুষ দৃষ্ট হয়। এইপ্রকার আত্মরক্ষার চেষ্টার ফলে মানুষ গাছের উপরিস্থ বাসা ছাড়িয়া গিরিগুহা আশ্রয় করিল; এবং গিরিগুহাতে যথাযুক্ত সংকুলান না হওয়ায় ক্রমশ কুটীর প্রভৃতি, এবং কুটীর হইতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

আত্মরক্ষার সূত্র ধরিয়াই যেমন অট্টালিকার অভিব্যক্তি হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের অনুমান হয় যে, আত্মরক্ষার সূত্র ধরিয়াই পরিচ্ছদেরও অভিব্যক্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ শীতগ্রীষ্মবর্ষা প্রভৃতির কঠোর তাড়না হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টাসূত্রেই পরিচ্ছদের অভিব্যক্তির সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আদিম মানব আত্মরক্ষার জন্য গাছের উপরেও বাসা বাঁধিয়া থাকিত। হয়তো সেই সময়ে সে বড় বড় গাছের বড় বড় পাতা দ্বারা শীত, গ্রীষ্ম, বিশেষতঃ বর্ষার হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উপযোগিতা লক্ষ্য করিয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম সেই সমস্ত পাতা দ্বারাই আদিম মানব দেহ ঢাকিবার চেষ্টা করিত। ক্রমে জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে অগ্রসর হইলে মানুষ গাছেরই আঁশে পাতার শুষ্ক বোঁটা বা ছোট ছোট সরু ডালের সাহায্যে পাতা-গুলি সেলাই করিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিত। এখনও কোন কোন অসভ্য জাতির কটি-আচ্ছাদক পত্রপরিচ্ছদে ইহার আভাস পাওয়া যায়। পরে যখন বড় বড় পশুগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া মানুষ তাহাদের চর্ম্ম পাইতে লাগিল, তখন সে সেই সমস্ত চর্ম্ম হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষা করিত। সেই সকল পরিচ্ছদ অস্থি-নির্ম্মিত ছুঁচের দ্বারা শুষ্ক অন্ত্রাদির সাহায্যে সেলাই করা হইত। বলা বাহুল্য, এই চর্ম্মপরিচ্ছদের অভিব্যক্তি হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, সেই আদিমকালেও সকল মানুষের সকল সন্তান সমান সুস্থ ও সবল-কায় হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। কাজেই দুর্ব্বল-তর সন্তানগণের পক্ষে বৃহৎকায় পশুগণকে সংগ্রামে নিহত করা এবং তাহাদের চর্ম্মসংগ্রহ করিয়া পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করাও দুরূহ হইতে লাগিল। ক্রমে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার কারণে মানুষদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বাড়িতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশই তীব্রতর হইতে থাকিলেও মানুষ দেহ আচ্ছাদিত রাখিবার অভ্যাস আর ত্যাগ করিতে পারিল না। তখন দেহ আচ্ছাদিত রাখা মানুষের খুবই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই আচ্ছাদনজনিত সুখের আস্বাদ বেশ উপলব্ধি করিয়াছে। কাজেই বাধ্য হইয়া মানুষ আত্মরক্ষার উপযোগী দেহাচ্ছাদনের সহজ-লভ্য উপকরণের সন্ধান করিতে লাগিল। তখন তুলার সন্ধান করিতে লাগিল। তখন তুলার সন্ধান পাওয়া গেল। তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত হইল এবং সুতার সাহায্যে বস্ত্র ও পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়া আত্মরক্ষার উপায়বিধান সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। এই প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্ব-

বিধ পরিচ্ছদেরই মূল উদ্দেশ্য ও অন্যতর চিরন্তন লক্ষ্যই হইল আত্মরক্ষা।

এখন দেখা যাক যে, ভারতবাসীর পক্ষে কোন্ প্রকার পরিচ্ছদ সুলভ ও আত্মরক্ষার উপযোগী। মোটামুটি ধরা যাইতে পারে যে, হিমালয়ের তল-দেশ হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সকল অংশই উষ্ণপ্রধান। সুতরাং বিভিন্ন ঋতুর কঠোরতা এড়াইবার জন্য হিমালয়ের পরপারে এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পশমনির্ম্মিত রাশি রাশি গরম কাপড় পরা যেরূপ সুখের কারণ হয়, এদেশে তাহা সাধারণত সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠে। এদেশে শীতের কয়েকমাস গরম কাপড় সুখদায়ক হইলেও সাধারণত সারা বৎসরই অনাবৃত দেহে অতিবাহিত করা যাইতে পারে। দেখা যায় যে, ঘোর শীতের সময়েও সূর্য্য ও অগ্নির উত্তাপে শরীর তাতাইয়া লইয়া এদেশের দরিদ্রসাধারণ সুতার নির্ম্মিত সামান্য বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সহজেই দিন অতিবাহিত করে। শীতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বেশী কাপড় বা গরম কাপড় পরিলে দেহ শুকাইয়া যায়—আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে আত্মবিনাশ সাধিত হয়। কাজেই, এদেশে আত্মরক্ষা করিতে চাহিলে খুব হালকা পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সুতার কাপড়, বিশেষত খদ্দরের কাপড়, সহজলভ্য এবং সকল ঋতুর পক্ষে উপযোগী বলিয়া জাতীয় পরি-চ্ছদের জন্য তাহারই সমধিক প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

স্বাধীনতা হইল আত্মরক্ষার প্রাণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহা সবিস্তার বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক হইলেও আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, আত্মরক্ষা প্রকৃতপক্ষে সাধন করিতে গেলে স্বাধীনতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। কাজেই জাতীয় পরিচ্ছদ স্থির করিতে গেলেও দেখিতে হইবে যে, কোন্ প্রকার পরিচ্ছদে স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। উচ্চ-পদস্থ একজন ইংরাজ রাজপুরুষ আমাকে বলিয়া-ছিলেন যে, "সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলেও ধুতিচাদর-পরা কোন জাতিকে স্বাধীন দেখিতে পাইবে না; স্বাধীন জাতিমাত্রেই কোন-না কোন প্রকার আঁটসাট পোষাক পরে"। জাতীয় পরিচ্ছদ-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটা ভাবিবার বিষয় বটে। ইহা সহজ কথা যে, আমাদের মধ্যে যেভাবে কোঁচার বাহার দিয়া ধুতিচাদর পরিবার প্রথা আছে, সে ভাবে ধুতিচাদর ব্যবহারে স্বাধীনতা দূরে থাক, আত্মরক্ষা করাই সম্ভব নহে। কেহ তোমাকে অন্যায়পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আসিল; তোমার শক্তি থাকিলে তুমি তাহা পরাহত করিবে, তোমার শক্তি না থাকিলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু কোনপ্রকারে কোঁচা-কাছা খুলিয়া গেলে—এই অবস্থায় যাহা খুলিয়া যাওয়া মোটেই অসম্ভব নহে—তুমি তাহা সামলাইবে না আত্মরক্ষা করিবে? স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানে বামহস্তে কোঁচা ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিবার এবং পায়ের গুল্‌ফসন্ধি পর্য্যন্ত ধুতি নামাইয়া পদে পদে হোঁচট খাইবার উপযোগী করিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে ধুতি পরিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, সে প্রথানুযায়ী ধুতি-চাদরের সদ্ব্যবহার করিলে স্বাধীনতা কিছুতেই অর্জ্জন করা যাইবে না, সুতরাং আত্মরক্ষাও অস-ম্ভব হইবে।

অনুমান হয় যে, ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারতের বীর জাতিগণ তাহাদের পুরুষদিগকে দূরে থাক, রমণীদিগকেও আততায়ীদিগের সহিত প্রয়ো-জনমত সংগ্রাম করিবার উপযোগী পরিচ্ছদ ধারণের অধিকার প্রদান করিয়াছে। সম্ভবত ম্লেচ্ছ যবন-দিগের সঙ্গে অনবরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবার ফলেই পশ্চিমাঞ্চলের রমণীগণ পায়জামা পরিবার অধিকার পাইয়াছে; এবং মুসলমানদিগের সহিত প্রলম্বিত সংগ্রামের ফলেই মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষি-ণাত্য অঞ্চলের রমণীদের মধ্যে, আমাদের পক্ষে বিসদৃশ ঠেকিলেও অনতিদীর্ঘ সাড়ী কাছা দিয়া পরিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ প্রয়ো-জন পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এই প্রথা রক্ষা করার পক্ষে একপ্রকার এই শপথ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক কাছা দিয়া সাড়ী না পরিলে তাহার হাতের জল শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ইহার বিপরীতে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় দেখি না যে, বাঙ্গালী জাতি ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শনের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া স্ত্রীলোক-দিগকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল; সুতরাং বঙ্গরমণীর সাড়ী পরিবার প্রণালী

অবরোধেরই উপযোগী হইয়া থাকিল। আমার ইহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, বঙ্গরমণীকেও পায়জামা পরিতে হইবে, অথবা কাছা দিয়া সাড়ী পরিতে হইবে। আমার এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যদি আমাদের প্রাণগত ইচ্ছা হয়, এবং সময়ে যদি সেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নামিতে হয়, তবে ভারতের কোন প্রদেশেরই পুরুষের পক্ষেও হোঁচটখাওয়া গোছের ধুতিচাদর পরিবার প্রথা রাখিলে চলিবে না, স্ত্রীলোকের পক্ষেও সহজে খুলিয়া যাইবার উপযুক্ত ভাবে সাড়ীমাত্র পরিলে চলিবে না। জাতীয় পরিচ্ছদ হিসাবে, ভারতের পুরুষের জন্যও যেমন আঁটসাঁট কোনপ্রকার পরিচ্ছদ আবশ্যক হইবে, ভারতের রমণীরও জন্য সেইরূপ কতকটা আঁটসাঁট কোনপ্রকার পরিচ্ছদ নিশ্চয়ই আবশ্যক হইবে।

সাধারণত আমরা পরিচ্ছদের দুইটী উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লই—একটী আত্মরক্ষা, দ্বিতীয়টী লজ্জানিবারণ। বেশ করিয়া তলাইয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, লজ্জানিবারণেরও ভিতরে আত্মরক্ষার ভাব অন্তর্নিগূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে। আত্মরক্ষা হইতে লজ্জাবৃত্তি অভিব্যক্ত না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে যে পুষ্টিলাভ করে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শরীরের যে যে অংশে আঘাত লাগিলে অতিরিক্ত অনিষ্ট হয়—কেবল নিজের নহে, কিন্তু বংশানুক্রমে অনিষ্ট সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, লজ্জার নামে দেহের সেই সেই অংশই বিশেষভাবে আচ্ছাদিত করিয়া নিরাপদ করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। ক্রমে সেই ব্যক্তিগত লজ্জার ভাব জাতি ও সমাজের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সমাজের মধ্যে কোন্ কার্য্য লজ্জাজনক, আর কোন্ কার্য্যটী লজ্জাকর নহে, তৎসম্বন্ধে যে অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখা যায়, আত্মরক্ষার উপায়সম্বন্ধীয় ভাব ও অভিজ্ঞতার পার্থক্যই তাহার কারণ। এ বিষয়ে এখানে সবিস্তার আলোচনা করিবার অবসর না থাকিলেও দুই একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে খোলসা করিয়া বুঝাইতে চাই।

ইউরোপীয় সকল জাতির কি না জানি না, অন্তত ইংরাজ জাতির রমণীগণ বক্ষস্থল প্রভৃতি দেহের অনেক অংশ স্বাভাবিকভাবে অনাবৃত রাখে না, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে দেখাইবার জন্যই পরিচ্ছদের সাহায্যে অনাবৃত রাখে এবং নানা উপায়ে সেই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাহাতে উহারা লজ্জাবোধ করে না। আমাদের দেশে ঐ ভাবে দেহের নগ্নতা দেখাইতে গেলে অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে; অথচ স্বাভাবিকভাবে দেহের অনেক অংশই অনাবৃত থাকিলে তাহা লজ্জাজনক বিবেচিত হইবে না। এই পার্থক্যের কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইংরাজদের মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথার আধিক্য থাকাতে বংশবিস্তারসূত্রে জাতি ও সমাজ সংরক্ষণের জন্যই রমণীদিগের পক্ষে পাকেপ্রকারে পুরুষদিগকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে উহার বিপরীতে বিবাহে সম্প্রদান প্রথারই প্রাধান্য থাকায় পুরুষদিগকে ঐ ভাবে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ইংরাজদিগের নিকট শুনিয়া শুনিয়া আমাদের এক ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে যে, আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান হওয়াতে ভারতবাসী স্বভাবত এবং সাধারণত পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা অধিকতর কামুকতাপ্রবণ। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ও পাশ্চাত্যের পোষাকপরিচ্ছদ এবং আচারব্যবহারই ঐ ধারণার ভ্রমাত্মকত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। ভারতবাসী বেশী কামুক হইলে তাহার পোষাকের ঢংও তদনুযায়ী সংগঠিত হইত। আর ঐ যে ভারতে স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ভাবে অঙ্গ অনাবৃত রাখিবার কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাও ভারতের যে যে অংশে অবরোধ প্রথার প্রাধান্য বশতঃ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সম্পর্করহিত অন্তঃপুরে বেশীর ভাগ থাকে, সেই সেই অংশেই সমধিক প্রচলিত দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রদেশে অবরোধপ্রথা নাই, সে সকল প্রদেশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এরূপ অনাবৃত রাখিবার রীতি দেখা যায় না। উপরোক্ত আলোচনার ফলে আমাদের মনে হয় যে, ভারতের জাতীয় পরিচ্ছদ এমনটী হওয়া উচিত, যাহাতে লজ্জাহীনতা প্রকাশ

না পায়, প্রত্যুত যাহা দ্বারা দেহের দুর্ব্বল অংশগুলি সুরক্ষিত হইয়া সলজ্জভাব যথাযুক্ত প্রকাশ পায়।

তবে কি আমাদের সমাজে ধুতিচাদরের স্থান নাই? ভারতবাসীর পক্ষে ধুতিচাদর কি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য? তাহা যদি হইবে, তবে ধুতিচাদর এদেশে স্থায়িত্ব লাভ করিল কি প্রকারে? আমরাও বলি, এদেশের পক্ষে ধুতিচাদরের উপযোগিতা না থাকিলে উহা স্থায়িত্ব লাভ করিত না। উহারও উপযোগিতা এবং ব্যবহারের অবসর নিশ্চয়ই আছে। কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে যখন আমরা গৃহে ফিরিব, তখনই কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচ্ছদ খুলিয়া রাখিয়া ধুতিচাদর ব্যবহার করিয়া দুদণ্ড আরাম অনুভব করিবার অবসর। কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া ধুতি-পরিহিত অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহে মুক্ত গগনের নিম্নে বসিয়া যখন মলয়পবন সেবন করা যায়, সে আরাম উপভোগের তুলনা কোথায়? সেইপ্রকার দেবপূজায় বসিবার জন্যও ধুতিচাদরের বিশেষ উপযোগিতা আছে। স্নানান্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধুতিচাদর পরিয়া যখন পবিত্রদেহে ও পবিত্র মনে দেবপূজায় বসা যায়, সে পবিত্রভাবের তুলনা কোথায়? সে পবিত্রভাব ভারতের হিন্দু ব্যতীত আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। গৃহের ভিতরে তুমি যতই কেন আলগা রকমের কাপড় পর না কেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তির কোন কারণ নাই; কিন্তু বাহিরে কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় আঁটসাঁট রকমের কোন পরিচ্ছদ পরা যে যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গৃহের ভিতরেও যে ধুতি-চাদর পরিবে, তাহাতেও লক্ষ্য রাখা উচিত, যাহাতে পুত্রকন্যাদিগের নিকটেও যথাযথ শ্লীলতা রক্ষিত হয় এবং লজ্জার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। বাহিরেও যদি ধুতিচাদর পরিয়া বাহির হইতে হয়, তবে তাহা উপযুক্তরূপে আঁটসাঁটভাবে পরা উচিত।

জাতীয় পরিচ্ছদের যখন কথা উঠে, তাহা বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রসূত্রেই উঠে। গৃহে তুমি তোমার সুবিধামত পরিচ্ছদ পরিতে পার, কিন্তু বাহিরের পরিচ্ছদে সকল ভারতবাসীর মধ্যে একটা সাধারণ ঢং থাকা উচিত—যে ঢং পোষাক পরিয়া শত নয়নের দৃষ্টিকেন্দ্র হওয়া ঠিক বলিয়া মনে করি না। তুমি কবিই হও বা দার্শনিক হও, তুমি ঐতিহাসিক হও বা কেরাণীই হও, তোমরা যে দেশের অধিবাসী হইবে, বাহিরে যাইতে গেলে সেই দেশের সেই জাতির উপযুক্ত সাধারণ ঢংয়ের পোষাক পরিয়া বাহির হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। উহারই উপর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আকৃতিপ্রকৃতি অনুসারে কাটছাঁট করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ সুশোভন করিতে পারে।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, ভারতবাসী সকলেরই পক্ষে জাতীয় পরিচ্ছদরূপে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা আত্মরক্ষার অনুকূল হওয়া উচিত, স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী হওয়া উচিত, হালকা রকমের এবং সুলভ হওয়া উচিত। সুলভ করিতে গেলে পরিচ্ছদ খদ্দরের করিতে হয়—অবশ্য শীতের সময় ধনী ব্যক্তি পশমের কাপড় ব্যবহার করিতে পারেন। হালকা করিতে গেলেও সুতারই করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন খদ্দরের কাপড় বড় ভারী হয়। সেটা ভুল। হাতে কাটা সরু সুতার কাপড় যথেষ্ট হালকা হইতে পারে। শালীনতা রক্ষার উপযুক্ত পোষাক চাহিলেও বোধ হয় খদ্দরেরই কাপড় সুবিধাজনক। শান্তিপুরী দিগম্বরী প্রভৃতি ধরণের সাড়ীধুতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়াই মনে হয়। আঁটসাঁট পোষাক করিতে গেলেও খদ্দর সকল দিকেই উপযুক্ত। পুরুষদের পক্ষে সকল দিক বজায় রাখিয়া আঁটসাঁট পোষাক স্থির করিতে গেলে মনে হয়, পার্শী কোটের মত একটা কোট এবং তলদেশে একটু আঁটসাঁট পায়জামাই হৌক বা প্যাণ্টই হৌক অনিবার্য্য। তবে যাহারা ইহাও যোগাইতে অক্ষম হইবে, তাহারা না হয় ধুতিই পরিবে, কিন্তু মালকোচ্ছা কতকটা মারিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসীদের মত। মেয়েদের পক্ষে সকল দিক বজায় রাখিয়া জাতীয় পরিচ্ছদ স্থির করিতে গেলে মনে হয়, গলা হইতে অন্ততঃ হাঁটু পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করে এইরূপ একটা সেমিজের মত কাপড়, জ্যাকেটের মত একটা কিছু এবং সাড়ী অনিবার্য্য। সেই সাড়ী তুমি কাছা

দিয়াই পর অথবা নিজের অভিরুচিতে অন্য কোন ভাবেই বিন্যস্ত কর—অশোভন না হইলে এবং আত্মরক্ষার প্রতিকূল না হইলেই হইল।

আমি অনেকদিন যাবৎ এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। সেই আলোচনার ফলে যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহাই দেশনেতা সুধীবর্গের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিলাম। আমার মনে হয়, বিষয়ের গুরুত্ব এত যে, অন্তত পুরুষদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্থির করিবার জন্য কংগ্রেসে এবিষয় উপস্থিত করাও যুক্তিসঙ্গত। কংগ্রেসের কর্ত্তব্য জাতীয় পরিচ্ছদের মোটামুটি ভাব স্থির করিয়া দেওয়া—খুটিনাটিগুলি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে স্থির করিবে।

সমাজ ও সংস্কার।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

এদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে যে কয়েকটী সংস্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই তাহা যথাক্রমে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন। উহাদের মধ্যে চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন দশ-পনের বৎসর পূর্ব্বে দিবসত্রয়ের মধ্যে পরিসমাপ্ত হইত। আজকালকার দিনে একদিনেই শেষ হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন হিন্দুসমাজেও বড় একটা অনুষ্ঠিত হয় না। রুচির পরিবর্ত্তন উহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন হারীতসংহিতায় ও পরবর্ত্তী সময়ের ভবদেব-পদ্ধতিতে সব-কয়েকটিরই উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে অনুষ্ঠানের প্রচলন করিয়া যান, তাহাতে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন আদৌ স্থান পায় নাই। ঐ পদ্ধতির মধ্যে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, উপনয়ন, দীক্ষা, বিবাহ, উদীচ্যকর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ স্থান পাইয়াছে। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উপনয়নেই গায়ত্রীদীক্ষা হইয়া যায়; স্বতন্ত্র দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। অনেকে আবার উপনয়নের পরে তান্ত্রিক গুরুর নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্রের দীক্ষা লন। এইরূপে হিন্দুসমাজে অনেক দিন হইতে দীক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও ভবদেবপদ্ধতির ভিতরে দীক্ষা বলিয়া স্বতন্ত্র সংস্কারের উল্লেখ নাই। কুশণ্ডিকা বিবাহসংস্কারের অঙ্গীভূত হওয়ায় ভবদেবপদ্ধতিতে উহা স্বতন্ত্র সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে উদীচ্যকর্ম্ম স্বতন্ত্র সংস্কার বলিয়া উল্লেখ আছে; এবং স্বতন্ত্র সংস্কার বলিয়া উহা পরিগণিত হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ প্রাচীন পদ্ধতিতে বা ভবদেবে সংস্কাররূপে উল্লিখিত হয় নাই। বোধ হয় মৃতের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উহা জীবিতের সংস্কার বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও আমাদের কর্ত্তব্য থাকে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের পরিসমাপ্তি হয় না বলিয়া অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে বিশেষ চিন্তাসহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধও সংস্কার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগকে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে সংস্কার শব্দের প্রকৃত অর্থ কি। শাস্ত্রের ভিতরে এক স্থানে সামান্য মাত্র উল্লেখ আছে—"পূতো ভবতি" সংস্কার দ্বারা পূত বা পবিত্র করা হয়। গর্ভাধান হইল, তাহাও শাস্ত্রের আদেশ অনুযায়ী হওয়া চাই। ভগবান সৃষ্টির ভিতরে বহুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও সন্তানসন্ততির জন্মদানে বহু করিতে হইবে, তাঁহার আদেশে বিবাহিত জীবন যাপন করিতে হইবে; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিবাহকার্য্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের তুষ্টিসাধন জন্য নহে। এই উচ্চ লক্ষ্য ধরিয়া থাকিতে হইবে যে, বিবাহ করিতেছি, ঈশ্বরের আদেশ ও ইঙ্গিত বুঝিয়া। 'পুংসবন' শব্দের অর্থ পুমান্ সূয়তে অস্মিন্, শাস্ত্রেতে ইহাও আছে "পুংসবনাৎ পুংসী করোতি"। পুত্রকামী হইয়াও ভগবৎকৃপার প্রার্থী হইতে হইবে। যখন গর্ভমধ্যে স্পন্দনমাত্র অনুভূত হয় নাই, ভ্রূণ জন্মিয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে চেতনা সঞ্চারিত হয় নাই; তখন হইতেই উহার সংস্কারের আবশ্যকতা শাস্ত্রকারগণ বুঝিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কার না থাকিলে কোন জাতির মধ্যে যথার্থ সাত্ত্বিক প্রকৃতি বিগঠিত হইতে পারে না। এই সাত্ত্বিক জাতি গঠন করিবার জন্য যে-কিছু পূর্ব্ব আয়োজনের প্রয়োজন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহা সমস্তই সম্পন্ন করিয়াছিলেন; কোন অবসরকেই তাঁহারা অবহেলা করেন নাই।

মীমাংসা-গ্রন্থের আলোচনার ভিতরে দেখিতে পাই—"সংস্কারো দোষাপনয়ো গুণাধানো বা" সংস্কার দ্বারা দোষ অপনীত হয় এবং গুণ জন্মে। মীমাংসাগ্রন্থে হিন্দুর আচার-ব্যবহার, পূজার আয়োজন-উপকরণ সমর্থিত হইয়াছিল। তাই মীমাংসাকার সংস্কারের মর্ম্মনিহিত ঋষিদিগের সূক্ষ্ম লক্ষ্যের দিকে সেরূপ জোর না দিয়া "দোষাপয়ন ও গুণাধান" ইহারই উপর জোর দিয়াছেন। মীমাংসাকারের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করাও সঙ্গত নয়। মীমাংসাকার আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "স চ (সংস্কারঃ) দ্বিধা, দৃষ্টোঽপূর্ব্বশ্চ।" সংস্কার

দ্বিবিধ। সংস্কারের কতক ফল চক্ষে দেখিতে পাই, কতকগুলি অপূর্ব্ব বা অদৃশ্য। কোন কোন ক্রিয়বিশেষে ব্রীহি-যবাদির ব্যবহার হয়। এই ব্রীহির উপর জলের ছিটা (প্রোক্ষণ) দিবার বিধান আছে। মীমাংসাকার বলেন, ইহার কি উপযোগিতা তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ইহা ফল দান করে সুনিশ্চিত; কিন্তু কি ফল দান করে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। বেদে যখন উহার বিধান আছে, তখন নিশ্চয়ই উহা ফল দান করিবে—আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, মীমাংসাকার ইহাই বলিতে চান।

ঈশ্বরই আমাদের চিরসঙ্গী। সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মে আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই করিতে পারি না। উপনয়ন, বিবাহ বা দীক্ষা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ যাহাই বল না, তাঁহার মঙ্গলহস্ত তাঁহার সামীপ্য আমাদিগকে সম্পদে বিপদে অভ্যুদয়ে বা বিনাশে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। উপনয়ন ধর্ম্মশিক্ষার প্রথম আয়োজন, সংযমের প্রথম চেষ্টা, ব্রহ্মচর্য্যলাভের দিকে প্রথম পাদবিক্ষেপ; তাই ভগবানকে লইয়া সে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে হয়। বিবাহ করিতে যাইতেছি, বুঝিতে হইবে যে পিতামাতা ও অভিভাবক বা পুরোহিত বিবাহ-বন্ধনের কর্ত্তা নহেন,কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জীবনব্যাপী বন্ধনের সংযোজয়িতা স্বয়ং ভগবান। মৃত শরীর বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতেছি, তাহার ভিতর শুনিতে হইবে ভগবানের ডাক, যিনি ইহলোক হইতে পরলোকে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। শ্রাদ্ধের ভিতরে তাঁহার স্নিগ্ধ ও করুণ হস্তের মঙ্গলস্পর্শ আমাদিগকে অনুভব করিতে হইবে। এইরূপে মৃতের উপর শেষ সম্মান তাঁহার আদেশে প্রদান করিতে হইবে। আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নে শোকভার লাঘব করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সামীপ্য ও সান্নিধ্য অনুভব করা এবং প্রতিদিন প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তাঁহাকে স্মরণ করা চাই। প্রভাতে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যেন হৃদয় হইতে উত্থিত হয়—

'মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবাদাজ্ঞয়ৈব সংসার-যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে'। হে মঙ্গলময় বিভু! তোমারই আদেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া সংসারে অবস্থান করিতে হইবে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ হইয়া অবস্থান করা তাহার চিরন্তন পিপাসা। এই সংহতিপ্রিয়তা তাহার চিরন্তন স্বভাব। পিপীলিকা দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, মধুমক্ষিকাও একাকী থাকিতে চাহে না; কিন্তু মানুষ ইহাদের সকলের অপেক্ষা বিশেষভাবে দলবদ্ধ হইয়া থাকে। তাই এক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন—"A man is a far more gregarious animal than an ant or a bee." মানুষ এই পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকা অপেক্ষাও অধিক সংহতি বা সমাজপ্রিয় জীব। কিন্তু সমস্ত মানব লইয়া একটি সমাজ হয় না। দেশ-কাল-ভেদে, প্রবৃত্তিভেদে, শীতোষ্ণতাভেদে, সভ্যতা-অসভ্যতাভেদে, কুরুচি-সুরুচিভেদে, অজ্ঞতা, শিক্ষা ও ধর্ম্মভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজের সংগঠন; আবার একই দেশে বিভিন্ন সমাজও বিদ্যমান আছে। এইরূপ বিভিন্ন সমাজের গঠন প্রধানত প্রাগুক্ত কারণ-সমূহের উপর নির্ভর করে। ধীরে ধীরে পুরুষ-পুরুষান্তর ধরিয়া সমাজ বিগঠিত হইয়া থাকে। এক-একটি সমাজের স্বতন্ত্র ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে যথেষ্ট কালবিলম্ব হয়। ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভিতরে বিবিধ শৃঙ্খলা, নিয়ম ও আচার ফুটিয়া উঠিতে থাকে; এবং ঐ ঐ সমাজের লোকেরা বংশপরম্পরাক্রমে উক্ত শৃঙ্খলা, নিয়ম ও আচারের অনুবর্ত্তন করে। কেহই উহা ভাঙ্গিতে সাহস করে না। ঐ বিশেষ নিয়ম, শৃঙ্খলা বা আচার ভঙ্গ করিলে সমাজ তাহাকে 'একঘরে' করে অর্থাৎ তাহাকে সমাজের ভিতরে রাখিতে চাহে না; তাহাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করে।

সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত নিয়ম বা আচার আছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই অর্থপূর্ণ; আবার এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা অর্থহীন। ইংরাজিতে উহাকে conventionalism বলে। এই সমস্ত নিয়মপ্রণালী দ্বারা আবার এক সমাজকে অন্য সমাজ হইতে পৃথক্‌রূপে চিনিয়া লওয়া যায়। হিন্দুরা পূর্ব্বাস্য হইয়া পুষ্করিণীতে ডুব দেয়, সোজা কলার পাতে অন্নব্যঞ্জন খায়, কাছা দিয়া কাপড় পরে; আর মুসলমানেরা ইহার বিপরীতে পশ্চিমাস্য হইয়া ডুব দেয়, উল্টা কলাপাতে ভাত খায়, এবং প্রায়ই কাছা খুলিয়া বেড়ায়। এই আচারগুলি সার্থক বা নিরর্থক হউক, প্রত্যেক সমাজ উহা পালন করিয়া তাহার বিশেষত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। ভাবে আচারে পোষাক-পরিচ্ছদে ও খাদ্যে সমতা দেখিতে পাইলে অন্যের প্রতি মানবের সহানুভূতি ধাবিত হয়। মিলন দেখিতে পাইলেই তাহার প্রতি অনুরাগ যায়। এই পরস্পর সহানুভূতি ও অনুরাগের উপরই যে সমাজ কতকটা প্রতিষ্ঠিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এই সমাজনিষ্ঠ বা সম্বদ্ধ হইয়া থাকিবার একটা মূল্য আছে। এক সময়ে সামাজিক ভাব যখন সুদৃঢ় ছিল তখন সামাজিক শাসন আমাদের চরিত্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করিত। কাহাকেও কুক্রিয়ান্বিত দেখিলে

সমাজ তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিত। সমাজের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিয়া অর্থদণ্ড দিলে সমাজ আবার তাহাকে তুলিয়া লইত। অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির মধ্যে সামাজিক শাসন আজও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে চলিতেছে। সকলেই সমাজের ভয়ে ভীত। পল্লীগ্রামে সামাজিক শাসন উন্মার্গ-গামীগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। তাহার ফলে অনেককে পল্লী ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার ভূমি নগরে আসিয়া বাস করিতে হয়। এই সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার ভাব ইংরাজদিগের সমাজের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। তাহারা ভাবে চিন্তায় বেশবিন্যাসে স্বাজাত্য-বোধে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ লালায়িত। তুমি এদেশের লোক—তুমি যদি বিলাতী রমণীর পাণিগ্রহণ কর বা কোন ইংরাজ যদি এদেশীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, ইংরাজ-সমাজ তাহাকে সেরূপ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিবে না; তাহার নিকট হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিবে।

হিন্দু বা মুসলমানগণের বিবাহপদ্ধতির ভিতরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আচার বিদ্যমান। বিবাহে উচ্চারিত মন্ত্রের অংশ বাদ দিলেও অনেক অর্থযুক্ত ও অর্থহীন আচারের অস্তিত্ব আছে। হিন্দুর বিবাহ বিশেষভাবে ভগবানকে মধ্যগত করিয়া ভগবানের সম্মুখে পরস্পরের শপথ গ্রহণে সুসম্পন্ন হয়; সুতরাং আজীবন সে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে উভয়েই বাধ্য। তাই ইহাতে বিবাহচ্ছেদের ব্যবস্থা কোথাও নাই। ইহাই হিন্দুবিবাহের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। অবশ্য দুই-এক স্থলে স্বামীর নির্যাতনে বিবাহচ্ছেদের আবশ্যকতা অনুভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে উহার জন্য স্বতন্ত্র কোন শাস্ত্রবিধি বা রাজবিধির আবশ্যক হয় নাই। হিন্দুর বিবাহ আমরণকাল স্থায়ী—কেহই কাহাকেও পরিহার করিতে পারেন না জানিয়া, ঘোর বিবাদ ও নির্য্যাতন সত্ত্বেও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ধরিয়া থাকিতে চায়—অমিলের ভিতরে থাকিয়া মিলনের সূত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরমণীর ভিতরে পতিপ্রাণতা এবং স্বামীর ভিতরে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের যে জীবন্ত চিত্র বহুল পরিমাণে নয়নগোচর হয় তাহা জগতে নিতান্ত দুর্ল্লভ, এমন কি সত্য সত্য অনুকরণীয়।

আজ-কাল পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকের অস্থিমজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে বিবাহ সময়ে ঈশ্বরের বা প্রজাপতির হস্ত সে ভাবে নিরীক্ষন করিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা 'সিভিল ম্যারেজ' অর্থাৎ চুক্তিমূলক বিবাহসম্বন্ধে যুক্ত হইবার প্রয়াসী। তাঁহারা কেবলমাত্র সমাজের শৃঙ্খলা ভগ্ন করিয়া সমাজভুক্ত সকলের সহানুভূতি ও অনুরাগ হারাইতেছেন তাহা নহে, তাঁহারা রূপজ ও গুণজ মোহে মুগ্ধ হইয়া সমাজের ভিতর হইতে ভগবানের আসনকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। সম্পদে বিপদে সমাজের সাহায্য ও অনুরাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া কতকটা শুষ্ক ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহারা হয় ত মুখে বলিতে পারেন যে, সমাজ চাহি না; কিন্তু হৃদয় তাহাতে ভিতর হইতে সায় দেয় না। এই যে exclusiveness সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যভাব—তাঁহাদের অন্তরের অনেক সাধুভাবকে সে ভাবে অঙ্কুরিত হইতে দেয় না—অপরের প্রতি স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতির বিকাশক্ষেত্র তাঁহাদের নিকট সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে; এইরূপেই সমাজের স্নেহধারা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া জীবনকে ভারবহ করিয়া ফেলেন। প্রথম জীবনে তাহা মনে না হইতে পারে, কিন্তু পুত্র-কন্যায় যতই গৃহ ভরিয়া উঠিতে থাকে, ততই জীবনে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

আর একটি কথা, চুক্তিমূলক বিবাহে বিবাহচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে; স্বামী ও স্ত্রী তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানেন। হিন্দুর ভিতরে দাম্পত্য কলহ ঘটিলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনন্যগতি জানিয়া আবার মিলনাকাঙ্ক্ষী হইবার ব্যাকুলতা পরস্পর পোষণ করেন। অবশ্য চুক্তিমূলক বিবাহে পরস্পরের মধ্যে ঘোর মনোবাদ হইলে তাঁহারা পরস্পর আবার মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা যে একেবারেই পোষণ করেন না, আমরা এ কথা বলি না; তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্মুখে আইনানুসারে বিবাহ দেওয়ার পথ অনাবৃত দেখিয়া ঐ ঘোর অমিলনকে প্রায়ই চরম করিয়া দেখিতে থাকেন। পরস্পরকে ক্ষমা করিবার ভাব—যাহা হিন্দুদম্পতির কতকটা স্বভাবসিদ্ধ বা বাধ্যতা-মূলক—চুক্তির বিবাহে ঐ প্রবৃত্তি স্বভাবত হ্রাস হইয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ভারবহ কলহময় জীবন ধারণ করিতে অসহিষ্ণু হইয়া বিবাহচ্ছেদ করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হন এবং পরস্পরের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া নিজেকেই অপমানিত করিতে থাকেন। বিলাতে, পাশ্চাত্যদেশে ও বিশেষতঃ আমেরিকায় এই বিবাহচ্ছেদ মকদ্দমার আধিক্য দিন দিন এতই হইতেছে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ও সমাজের চিন্তাশীল অনুরাগীগণ দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। অবশ্য এদেশে যাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া চুক্তিমূলক বিবাহে মুগ্ধ হইতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে পিতৃ-পিতামহগত ক্ষমার ভাব অনেকটা বদ্ধমূল, তাই তাঁহারা কতকটা শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিবাহচ্ছেদের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেরূপ অদূরে ঘনায়িত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এদেশেও পাশ্চাত্য দেশের

মত বিবাহচ্ছেদ মামলার অচিরে বাহুল্য হইবে; এবং সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে, দুর্ভিক্ষে অনশনে, বৃক্ষতলে ও গৃহে আমাদের স্ত্রী যে আমাদের চিরসঙ্গিনী চির সান্ত্বনাদাত্রী পুণ্য ভারতের এই সমুজ্জ্বল আদর্শ বুঝি ম্লান হইয়া যাইবে। যাঁহারা চুক্তিমূলক নিরীশ্বর বিবাহের পক্ষপাতী আমরা তাঁহাদিগকে এই কথাগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে বলি। সত্য সত্যই আমরা চিরদরিদ্র—একেবারেই নির্ধন জাতি। দাম্পত্য-জীবনের সুশীতল ছায়াই আমাদের মত ক্লিষ্ট নিষ্পেষিত জাতির এক মাত্র সুশীতল আরামের স্থান। উহা হইতে বঞ্চিত হইলে, জানি না, কি ভীষণ দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিবে! তাই আমরা মনে করি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তনায় তিন আইনের চুক্তিমূলক রেজেষ্ট্রী অংশ বাদ দিয়া কেবলমাত্র ভগবানকে সাক্ষী করিয়া যে দুই-তিনটি বিবাহ হইয়া গেল, তাহার বিশেষ সার্থকতা আছে। ঐরূপ ভাবী বিভীষিকা পূর্ব্ব হইতেই নিরস্ত করিতে না পারিলে এ জাতির কল্যাণ নাই, তাহা আমাদের পক্ষে বলা বাহুল্য মাত্র।

রাজা রামমোহন রায়।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী সাহিত্যনিধি)

প্রায় ৯৫ বৎসর পূর্ব্বে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায় সুদুর সমুদ্র পারে তাঁহার নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। ৺অক্ষয় কুমার দত্ত এক স্থানে বলিয়াছেন—"আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে।" আজ আমরা আমাদের সেই মৃতাশৌচ আবার নূতন করিয়া অনুভব করিতেছি। এই ২৭শে সেপ্টেম্বরের মৃতাশৌচ সেদিন সমগ্র বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে হইলে, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের তৎকালে কি ক্ষতি হইয়াছিল তাহা জানিতে হইলে, আরও দেড়শত বৎসর আগেকার বাংলা দেশকে জানিতে হইবে, তবেই বুঝা যাইবে রামমোহন রায় বাংলার কি ছিলেন।

রামমোহন রায় ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়—বাংলাদেশের অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস। ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজসংস্কার, রাজনীতি, শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি জাতীয় উন্নতির যে কোন ধারার মূল অন্বেষণ করিতে গেলে, রাজা রামমোহন রায়ের নামে গিয়া পৌঁছিতে হয়। সর্ব্বপ্রকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বীজ তিনিই বপন করিয়াছেন। নূতন যুগের সূর্য্য তখনও দিক্‌চক্রবালের নিম্নে; রাজা রামমোহন রায় সেই নবরবির আগমনবার্ত্তা জানিয়া প্রাচীনকালের ঋষিদের মত নূতন ছন্দে তাঁহার আবাহন গান গাহিয়াছেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় এই বাংলাদেশে এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ বাংলা ১১৮১ সাল। তখন বাংলাদেশের বড় দুঃসময়। তেমন দুর্দ্দিন বাংলাদেশে বুঝি আর কখনো আসে নাই—উহার ১৭ বৎসর আগে পলাশীর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসর আগে হইয়া গিয়াছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বঙ্গমাতার অবস্থা তখন "সুজলাং সুফলাং শস্য-শ্যামলাং"—নয়, বঙ্গজননী তখন অস্থিচর্ম্মসার। তখন বলিতে গেলে রাজশাসন বলিয়া বাংলায় কিছুই ছিল না। মুসলমান গিয়াছে; ইংরাজ বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত। বাংলার শিল্প, বাংলার বাণিজ্য তখন ধীরে ধীরে বিদেশীর করায়ত্ত হইতেছে; রক্ষা করিবার কেহ নাই। তখন বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বলের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইত; দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না—জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ডাকাইতের দল। তখন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারের ফলে বাংলার নারীগণ বিনা বাক্যব্যয়ে কত রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতেছিলেন; বহু যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিবার কেহ ছিল না।

রাজা রামমোহন রায় বাংলার এই অন্ধকারময় দুর্দ্দিনের অরুণতপন। রামমোহন যখন বালক, তখন এদেশে রাজসরকারে আরবী-পারসী ভাষা চলিত। ঐ সকল ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী তখন পর্য্যন্ত রাজভাষা হইয়া উঠে নাই। সেই জন্য তাঁহার অভিভাবকেরা প্রথমেই তাঁহাকে আর্ব্বী-পার্সী শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি মাতাপিতাকে ছাড়িয়া সুদুর পাটনা সহরে গেলেন বিদ্যাশিক্ষার জন্য। কিছু দিন আর্ব্বী-পার্সী শিক্ষার পর ঐ দুই ভাষা বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়া তিনি বারাণসীতে কিছু দিন থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা দ্বারা হিন্দু সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

চিন্তা করিতে গেলে বড়ই আশ্চর্য্য মনে হয়, সেই দেশব্যাপী কুসংস্কারের দিনে কি করিয়া শিশু রামমোহন রায়ের মনে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুক্তি আসিয়াছিল। কাশীতে তৎকালে বৈদান্তিক পণ্ডিতের অভাব ছিল না, কিন্তু কেহই ত এপর্য্যন্ত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই। আসল কথা এই, তিনি ছিলেন ভগবানের হাতের অস্ত্র! যে মহান্ কার্য্য তিনি সমস্ত

জীবন ধরিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার আরম্ভ হইল পৌত্তলিকতার প্রতিবাদে। তখন রামমোহন ১৬ বৎসরের বালক মাত্র। দেশের লোক তখন তাঁহাকে জানে না—চিনে না। প্রথম বাধা পাইলেন তিনি আপনার গৃহ হইতে—পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে। স্নেহময় পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনিও নিজের ধর্ম্মমতকে পাথেয় করিয়া বিপুল জগতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি, এই সময় ব্রিটিশ শাসনের উপর তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাহিরে অনেক স্থান তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেখানকার ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মমত সমস্তই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সকল প্রকার মতই অত্যন্ত উদার—তিনি ঔদার্য্যের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্কীর্ণতা বলিয়া কোন পদার্থ তাঁহার ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার বাল্যের শিক্ষা এই ঔদার্য্য অর্জ্জনে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, বলিতেই হইবে। তাঁহার শিক্ষার স্তরগুলি দেখিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারিব।

(১) মুসলমান মৌলবীর নিকট আর্ব্বী-পার্সী শিক্ষা।

(২) নিষ্ঠাবান হিন্দু-পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা।

(৩) দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, সকল রকম লোকের সহিত মেলামেশা।

(৪) ইংরাজী শিক্ষা; রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজের সহিত আলাপ-পরিচয়।

তিনি সকল দলের সহিত মিশিয়াছিলেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যত্নের সঙ্গে শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সকল জিনিষ শিখিবার এই স্পৃহা, শিক্ষার প্রতি এই একান্ত আগ্রহ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে রক্ষা করিয়াছে। তিনি যদি শুধু সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, ইংরাজ বা মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত। যদি এখনকার অনেক ছেলের মত শুধু ইংরাজীই জানিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদের সহিত মেলামেশা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না।

মহাত্মা কবীর সম্বন্ধে গল্প আছে—তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার হিন্দু শিষ্যগণ তাঁহাকে অগ্নিসৎকার করিবার জন্য এবং মুসলমান শিষ্যগণ তাঁহার দেহ কবরস্থ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যাপার হইয়াছিল। হিন্দু জানিতেন—"রাজা পরম ব্রহ্মজ্ঞানী—ঔপনিষদ ব্রহ্মের উপাসক"; মুসলমান জানিতেন—"রাজা জবরদস্ত মৌলবী"; খৃষ্টান জানিতেন—"রাজা বাইবেল-অনুরক্ত—যীশুর পরম ভক্ত"। তিনি যে ব্যক্তি বা জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে তাঁহার একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কখনও কাহারও মনে হয় নাই, তিনি অন্য দেশের মানুষ। এরূপ উদার এরূপ বিশাল মানুষ ভারতবর্ষে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কোন ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ছিল না—তবু কেন তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন? তিনি সমস্ত ধর্ম্মই মানিতেন; যে-কোন ধর্ম্মমতানুসারে পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করিলে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায়, তাহা রাজা রামমোহন রায় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন কেন? সে এক ধর্ম্মবিপ্লবের দিন। খৃষ্টান মিশনারীরা তখন প্রবল উৎসাহের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান উপায় ছিল অন্য প্রচলিত ধর্ম্মকে আক্রমণ ও নিন্দা করা। সেই কারণে তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মকেই সুযোগ ও সুবিধামত প্রচুর নিন্দা করিতেন। তাঁহারা প্রচার করিতেন—"হিন্দুধর্ম্মে পুতুল পূজা ছাড়া আর কিছুই নাই।" কেহ কেহ তাঁহাদের এই অসার উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। আজ বাংলাদেশে অনেকস্থানে বেদ-উপনিষদ ও গীতার চর্চ্চা হইতেছে; কিন্তু শতাব্দী পূর্ব্বে এ সকল কিছুই ছিল না। রাজা রামমোহন বাংলা দেশে নূতন করিয়া বেদোদ্ধার করেন। নিজের দেশবাসীগণকে এবং খৃষ্টান পাদরীগণকে তিনি জানাইয়া দিলেন—"অসার পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্মের কিছুই নহে। আধ্যাত্মিকতাই তার প্রাণ। বিমল ব্রহ্মোপাসনাই আর্য্য-ঋষিদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম।" ধর্ম্ম লইয়া তখন সর্ব্বত্র বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিরোধ চলিতেছিল। খৃষ্টান প্রচারক হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন। হিন্দু খৃষ্টান ও মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ বলিতেন এবং মুসলমানগণ মুসলমান ছাড়া আর সকলকেই কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ কল্পনা করিয়া, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমন্দির কোন জাতি বা ধর্ম্মবিশেষের নয়—তাহা সর্ব্বসাধারণের—মনুষ্যমাত্রের। ব্রাহ্মসমাজ একটী নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় নয়—পরন্তু সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি। রাজা রামমোহন রায় নিজের উদার অন্তঃকরণে এই জিনিসটীরই অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাহীন এক ধর্ম্মসমাজ, যেখানে ঈশ্বরের সকল সন্তানই উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় যোগ দিতে পারিবেন। রাজা রামমোহন রায়স্থাপিত

ব্রাহ্মসমাজ কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় নয়, ইহা মানবসাধারণের উপাসনার মিলনভূমি। যে কোন জাতীয় লোকের নিমিত্ত, যে কোন ধর্ম্মসমাজের লোকের জন্য ইহার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। এই উদারতাই রামমোহন রায়ের চরিত্রগত বিশিষ্টতা।

রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রের অন্যতম বিশিষ্টতা ছিল তাঁর স্বাদেশিকতা। তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। ইংরাজী শেখার পরও মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেন। এরূপ লোক তখনকার দিনে ছিল না বলিলেই হয়। রাজা ইংরাজী, পারশী-আরবী ও সংস্কৃত এই ত্রিবিদ্যায় সম্যক পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বাদেশিকতা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে অগ্রসর করিয়াছিল। তাঁহার উদারতা তাঁহাকে ইংরাজীশিক্ষার প্রচলনের জন্য চেষ্টিত করিয়াছিল। বাস্তবিক, তাঁহার চরিত্রে সার্ব্বজনীনতা ও স্বাদেশিকতার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষার সেই প্রারম্ভের দিনে সবাই ভাসিয়া যাইতে ছিলেন, তাহার মধ্যে জাগিয়াছিলেন শুধু রাজা রামমোহন রায়। ইংরাজী সভ্যতার স্রোতে রাজার জাতীয়তা ভাসাইয়া লইয়া তাঁহাকে রিক্ত করিতে পারে নাই। প্লাবন-পীড়িত বিশাল মহীধরের মত তিনি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রামমোহনের উদার মত দেখিয়া তখনকার দিনের অনেক ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন, বুঝি বা রাজা কালে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন; তাঁহারা সকলেই আশাহত হইলেন যখন দেখিলেন যে, রাজা ভারতের প্রাচীনতম আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ভেরী বাজাইয়া জাতীয় ধর্ম্মমন্দির (ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন, তখন ঐরাবত গজ ভাগীরথীস্রোতের বিপুল আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল; কিন্তু গঙ্গাপ্লাবন যখন জহ্নুমুনির তপোবন ভাসাইতে উদ্যত হইল, তখন তপোধন এক গণ্ডুষে গঙ্গার সমগ্র বারি পান করিয়া ফেলিলেন। তার পর জাহ্নবীর সংযত ধারা সমস্ত ভূখণ্ডকে সুজলা সুফলা করিল। সেইরূপ ইংরাজী শিক্ষার স্রোতে যখন অন্য সকলে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, রামমোহন রায় তখন গণ্ডুষে সেই সভ্যতার প্রবল ধারা পান করিয়া (assimilate) দেশের কল্যাণে তাহাকে নিয়োগ করিলেন। সাধারণ লোকের মত তিনি ইংরাজের হীন অনুকরণ করিলেন না—ইংরাজী সভ্যতার সারাংশ লইয়া দেশীয় ভাবে তাহাকে দেশের কল্যাণকর নূতন আকার প্রদান করিলেন। এইখানেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ।

নূতন যুগের নূতন রবিকে তিনি যে প্রাণে প্রাণে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য হইতে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। বাংলা দেশে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট যখন কলিকাতা নগরীতে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, রাজা রামমোহন রায় নিজে সংস্কৃত ভাষায় মহা পণ্ডিত এবং জাতীয় ভাবের পরম ভাবুক হইয়াও গবর্ণমেণ্টের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদন-পত্র পাঠে আমরা বুঝিতে পারি, অনতিদূর ভবিষ্যতে জাতিতে জাতিতে মিলনের যে ভেরী বাজিয়া উঠিবে, রাজা যেন তাঁহার দিব্য অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সেই শুভদিন দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয় তাঁকে তারস্বরে বলিয়া দিয়াছিল—বর্ত্তমান যুগে বিদেশের 'সঞ্জীবনী বিদ্যা' আয়ত্ত করিয়া তবে ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইবে। সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপনা করিতে হইলে, সমুদ্রপারের বিদ্যা তাহাকে শিখিতেই হইবে। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন—"এক একটী দেশ তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মমত লইয়া সমগ্র পৃথিবী হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিবে, জগতের সে দিন চলিয়া গিয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে সম্মিলিত হইবার শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে।"

আজ দেশে কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি জাতীয় সভায় সর্ব্বত্র জাতীয় ভাবের আলোচনা চলিতেছে, শতাব্দী পূর্ব্বে এ সকল কিছুই ছিল না। তখন কেবল এই সকল ভাব বীজরূপে একা রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। একশত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা বীজ ছিল, আজ তাহা বিশাল বনস্পতিরূপে সমগ্র দেশকে স্বাধীনতার সুশীতল ছায়া ও ফলদানে পরিতৃপ্ত করিতেছে। শুধু ভারতের বলিয়া নয়, সর্ব্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক একান্ত সহানুভূতি ছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনেও তিনি জনসাধারণের স্বাধীনতার পক্ষেই ছিলেন। স্পেনে যে দিন সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়, সে দিন কলিকাতা টাউনহলে তিনি এক ভোজ দিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজন তিনি একশত বৎসর পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলেন—তখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টিই হয় নাই বলিলে হয়। এই স্বাধীনতাস্পৃহাই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের অন্যতম হেতু। সাম্প্রদায়িক অধীনতার পাশ হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মোপাসনার উপযোগী করিয়া তোলাই ব্রাহ্মসমাজের কাজ। ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম—মানুষের স্বাধীনতার ধর্ম্ম; এখানে মানুষ শাস্ত্রের, প্রথার বা লোকাচারের অধীন নয়—মানুষ এখানে ব্রহ্মের উপাসক, আত্মার উপাসক, সত্যের উপাসক—সুতরাং স্বাধীনতার উপাসক।

যেদেশে আবহমান কাল হইতে স্ত্রী-জাতি পুরুষের দাসী মাত্র, যে দেশে নারীকে লইয়া পাশাখেলায় পণ রাখা যাইতে পারিত, যে দেশে পুরুষ ইচ্ছামত নারীর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে প্রচুর অত্যাচার করিয়াছে—কেহ কোন দিন তাহার প্রতিবাদও করে নাই, যে দেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে কেহ কেহ নারীকে নরকের দ্বার বলিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই, যেখানে সামাজিকেরা স্বামীর ছায়ারূপিণী ভিন্ন নারীর পৃথক অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন—সেই দেশে রামমোহন রায় নবযুগে প্রথম নারীপূজার মন্ত্র উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত করিলেন।

সত্য বটে মনুসংহিতায় নারীপূজার কথা লেখা আছে, কিন্তু সে লেখা অনুসারে নারীকে সম্মান দেখান কেহই আবশ্যক মনে করেন নাই। তিব্বতে একবার ধর্ম্মান্ধগণের দ্বারা রাজার জীবন সংশয় হয়, করুণারূপিণী নারী সে দিন তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই দিন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নারীকে তিনি প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্ত্রীচরিত্রের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে সকল অভিযোগ আনা হইত, তিনি একটী-একটী করিয়া প্রতি অভিযোগের অমূলকতা দেখাইয়াছিলেন; তাহার পর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী হইতে দেখাইয়াছেন—কত দুঃখ, কত কষ্ট, আমাদের বঙ্গনারী স্বামী-পুত্রের কল্যাণের জন্য সহ্য করিয়া থাকেন। এতটা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইত, যদি না তাঁহাদের ধর্ম্মবল থাকিত—শুধু ধর্ম্মবলেই তাঁহারা এই সকল দুঃখ-কষ্ট সহজে সহিয়া থাকেন।

তখন বাংলা দেশের সর্ব্বত্র সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। "জীবনে মরণে স্বামীর সহগামিনী" কথাটা কবিত্বের দিক দিয়া শুনিতে ভালই লাগে; কিন্তু একটী জীবন্ত মানুষকে জলন্ত আগুনে পোড়াইয়া মারার মত নৃশংসতা, স্ত্রীলোকের জীবনের এত বড় নির্দ্দয় অধীনতা আর কোন দেশের পুরুষ মানুষ কখন কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ যতই গাঢ়, যতই সুন্দর, যতই মধুর ও পবিত্র হৌক না কেন, একজনের জীবনাবসানে তাহার চিতানলে যে আর একজনকেও পুড়িয়া মরিতে হইবে—এ বিধান স্বাভাবিক বিধির ব্যভিচার। এই "সতীদাহ-প্রথা" কত দিন হইতে বাংলাদেশে চলিতে ছিল তাহা ঠিক নাই; সকলেই এ ঘটনা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, কেহই কোনদিন প্রতিবাদ করেন নাই। রামমোহন রায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হইবার পর সতীদাহ দেখিয়াই অস্থির হইয়া উঠিলেন—তাঁহার কোমল হৃদয়ে গভীর আঘাত লাগিল। এ প্রথায় তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিল না; তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন—"না—না—না—এ হ'তে পারে না—এ চ'লতে পারে না—এ নারীহত্যা—একে নিবারণ করতেই হবে।" সেই দিন হইতে তিনি এই মহা অকল্যাণকর প্রথা নিবারণের জন্য মন দিলেন; তার পর যে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হন নাই, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মনে শয়নে স্বপনে অন্য কোন চিন্তা ছিল না।

তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আর একটী ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, সেটী তাঁহার এই 'সতীদাহ-নিবারণ' সঙ্কল্পকে আরও প্রবল ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। উহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর স্বামীর চিতানলে সহমরণ। এই শোচনীয় ঘটনার সময় তিনি গৃহে ছিলেন না—বাড়ী আসিয়া শুনিলেন। সমাজ বা ব্যক্তি যখন মরণের পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা সহজ, সরল সত্যকে ছাড়িয়া দিয়া লোকাচার, প্রথা বা শুষ্ক শাস্ত্রবাক্য মানিয়া থাকে। তখন কার্য্যাকার্য্য বিচার করিবার মত বুদ্ধি-বিবেচনা তাহাদের থাকে না। নতুবা জলন্ত চিতানলে জীবন্ত নারীহত্যা কি করিয়া ধর্ম্মের নামে চলিয়াছিল, সহজবুদ্ধি মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না।

সতীদাহ নিবারণের মত বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রামমোহন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহুবিবাহ তখন এমন প্রবলভাবে সমাজে চলিতেছিল যে স্বয়ং রামমোহন রায়ও সে প্রথার হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার তিন বিবাহ ছিল। অবশ্য এ সমস্ত বিবাহ বাল্যকালে তাঁহার পিতার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল; এজন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। নারীকে তিনি সত্যই "পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ" বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেই জন্য সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারিয়াছিলেন। নারীর যোগ্য সম্মান নারীকে না দিতে পারিলে বাংলাদেশের উন্নতি কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। নারী পুরুষের সহকর্ম্মী, পুরুষের ধাত্রী, জননী, ভগিনী; তাঁহারা যদি লাঞ্ছিত, পদ-দলিত ও অশিক্ষিত থাকেন, তাহা হইলে সমাজের পুরুষও যে নিরুৎসাহ ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে। জীবনযাত্রায় নারীর সহযোগিতা পাওয়া দূরে থাকুক, নারীকে লইয়া পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে! আজ যে আমরা প্রাচীন ভারতের বিদুষী মহিলাগণের নাম করিতে গিয়া, কথায় কথায় লীলাবতী, খনা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নামোল্লেখ করি, এ সকল নামের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কর্ত্তা রাজা রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম যুক্তিতর্কের দ্বারা এবং পুরাণেতিহাসের নজির দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন যে, স্ত্রীলোক অল্পবুদ্ধি নন, শিক্ষা পাইলে তাঁহারাও শিক্ষিতা হইবার যোগ্যতা রাখিয়া থাকেন। বহুবিবাহ দ্বারা

স্ত্রীলোকের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার নিবারণের জন্য তিনি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ হইতে অনুকূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান, কিরূপ স্থলে পুরুষ দারান্তর গ্রহণ করিতে পারে—ইচ্ছা করিলেই নূতন নূতন কন্যার পানিগ্রহণ করিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাংলাদেশে সর্ব্ববিধ উন্নতির বীজ তিনিই বপন করিয়াছেন। শুধু ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কিংবা শিক্ষার বিস্তারে তিনি তাঁহার সমস্ত উৎসাহ বা কর্ম্মশক্তি নিঃশেষ করেন নাই। তাঁহার শক্তি ছিল অসাধারণ, উৎসাহ ছিল অদম্য, কার্য্য করিবার স্পৃহা ছিল অনন্ত। বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা তিনি। তাঁহার পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে গদ্য ছিল না। কবিতায় বাংলা সাহিত্য সেই প্রাচীন যুগেও যথেষ্ট উন্নত ছিল, কিন্তু গদ্য আমাদের সাহিত্যে একেবারেই চলন ছিল না বলিলেও চলে। তিনি তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক মতামত বাংলা গদ্যে প্রকাশ করিতেন। ইহা হইতেই বাংলা সাধারণপাঠ্য গদ্যের গতি নির্ণয় হয়। তাঁহার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দ্বয় বাংলা গদ্যকে যথার্থ সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করেন; কিন্তু বাংলা গদ্যের স্রষ্টা রামমোহন।

এই প্রকারে সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের দ্বারা দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। এ বিষয়েও তিনিই অগ্রণী। তাঁহার পূর্ব্বে কুসংস্কারের শিকল কাটিয়া সমুদ্রপারে যাইতে আর কাহারও ভরসা হয় নাই। দেশে থাকিয়া যতদূর সম্ভব দেশের কাজ করিয়া দেশব্রত রামমোহন স্বদেশের মঙ্গলের জন্যই বিলাত যাত্রা করিলেন। হায়, তখন কে জানিত, সেই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা—আর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তখন কে জানিত, সেই স্বাধীনতার উপাসক, মহাপুরুষ স্বাধীন ভূমি ইংলণ্ডের বাতাসে আপনার স্বাধীন আত্মাকে মিশাইয়া দিবেন।

চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, শতবৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়, নিজে জমিদার হইয়া, জমিদার-বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, কিরূপে বর্ত্তমান যুগের সাধারণ তান্ত্রিক ভাবের (democratic ideas) অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারের বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে সাধারণ প্রজার দুঃখও অনুভব করিতেন।

বিলাতে যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়,—"What is the condition of the cultivator, under the present Zemindary system of Bengal, and Ryotwary system of the Madras presidency?" বাংলাদেশের বর্ত্তমান জমিদারী প্রথা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রায়তী প্রথায় কৃষকের অবস্থা কিরূপ? তখন তিনি সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"Under both systems the condition of the cultivators is very miserable; in the one, they are placed at the mercy of the Zemindars' avarice and ambition; in the other, they are subjected to the oxtortion and intrigues of the surveyors and other Government revenue officers." দুইপ্রথাতেই কৃষকের অবস্থা অতি শোচনীয়। একটিতে তাহারা জমিদার মহাশয়দিগের লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার খেলার পুতুল মাত্র; অন্যত্র তাহারা গবর্ণমেণ্টের আমিন ও অন্যান্য কর-আদায়কারী কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের পাত্র।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের নানাবিধ কাজকর্ম্মের কথাই আলোচনা করিলাম, কিন্তু তিনি মানুষটী কেমন ছিলেন কোথাও তাহার উল্লেখ করি নাই; এইবার তাহা দেখাইয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। লোকের সহিত তাঁহার আচারব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক ছিল। কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি ভদ্র ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উহাঁর সমস্ত কাজকর্ম্মের কথা ভুলিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মধুর চরিত্রের কথা কেহ কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। বিদেশীয়েরা তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা লণ্ডনস্থ বন্ধুবান্ধবের চিঠিপত্র হইতে পাওয়া যায়। ঐরূপ একখানি চিঠি লণ্ডনস্থ প্রবাসী আমেরিকান ডাক্তার বাউট সাহেব মিঃ ইষ্টলিনকে রাজার সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"আমার বিচারে একমাত্র তিনি (রামমোহন) পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতীত কিংবা বর্ত্তমান কালে আমার বিচারে আমি এমন কাহাকেও দেখি নাই, যিনি তাদৃশ কোন সৌন্দর্য্যে ও মানবত্বে মণ্ডিত। * * * তিনি অতি উদার, অতি অমায়িক এবং অতি সরলপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন।"

তাঁহার মৃত্যু ইংলণ্ডে সেই সময় সেখানকার একজন জননায়কের মৃত্যুর মতই অনুভূত হইয়াছিল। তিনি সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন—যথার্থ প্রতিভাশালী পুরুষ; এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ প্রতিভা সচরাচর দেখা যায় না। যথার্থ প্রতিভাশালীর মত তিনি উপযুক্ত সময়ের বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে কথা আজ বুঝিতেছেন, সে কথা রামমোহন শতাব্দী পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন; রামমোহনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত

কোন দেশনায়কই কোন নূতনতর কার্য্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই—সকলেই রামমোহনের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিতেছেন।

সেইজন্য কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি সামাজিক আন্দোলন, কি সাহিত্যসৃষ্টি তরুণ বাংলার সর্ব্বত্র রাজা রামমোহন রায় কর্ম্মীগণের গুরু। তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন সেই পথে যাত্রা করিয়া দেশের সেবকগণ যথার্থ দেশসেবা কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ যে অভিনব নূতন রবি বাংলার আকাশে উদয় হইয়াছে, তাহার বন্দনা-গান শতবর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ই গাহিয়াছিলেন—স্বদেশহিতৈষিতার যে আগুন আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে অগ্নিকে প্রথম আবাহন করিয়াছিলেন রামমোহন রায়। তিনি সব দিক দিয়া জাতিকে যে সকল আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত মহাত্মার নিকট প্রার্থনা, যেন তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিবার শক্তি তাঁহার করুণাবলে আমরা লাভ করি—

হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয়-অচল-পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন
উঠিছে অরুণ রথে।

রাজা রামমোহন রায়ের পদানুসরণ করিয়া স্বদেশের গগনে এই নব উদীয়মান সূর্য্যকে বন্দনা করি।

শকুন্তলা (পঞ্চমাঙ্ক)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

শার্ঙ্গরব প্রকারান্তরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া থাকিতে বলিলেন। দুষ্মন্ত কিন্তু তাহাতেও স্বীকৃত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি শকুন্তলার স্বামী নহেন; কাজেই তিনি তাহা কি প্রকারে স্বীকার করেন? রাজা শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"তপস্বিন্! আপনি ইহাঁকে বঞ্চিত করিতেছেন কেন? শশাঙ্ক কুমুদকেই প্রস্ফুটিত করে, সূর্য্য পঙ্কজকেই প্রস্ফুটিত করে; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ পরদারসংস্পর্শ হইতে সর্ব্বদাই বিরত থাকেন।"

শকুন্তলার যাহা কিছু আশা ছিল এই বাক্যে তাহাও গেল। স্বামীগৃহে দাসীবৃত্তিও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

শার্ঙ্গরব এবারে ধীরভাবে রাজাকে বলিলেন—

"রাজন! যদি বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকিয়া শকুন্তলার সহিত প্রণয়বৃত্তান্ত ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তবে আপনি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি হইয়া ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহা কিরূপ হইবে?"

রাজা তদুত্তরে বলিলেন—"আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি বিচার করিয়া বলুন দেখি; হয় আমিই ভুলিয়া গিয়াছি,—নয় ইনিই মিথ্যা বলিতেছেন; এই সংশয় স্থলে আমি দারত্যাগী হব, না পরদারসংস্পর্শজনিত পাপী হব?"

বড় কঠিন সমস্যা। ইহার কি মীমাংসা আছে? শার্ঙ্গরব ইহার উত্তরে কি বলিতে পারেন? দুইটীর কোনটাই ছোট নহে। সমস্যা বড় গুরুতর। বাক্‌বিতণ্ডায় কিছু হইবে না। এই সকল সমস্যা পূর্ব্ব হইতে রাজার মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি সমস্তই ভাবিয়া চিন্তিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। রাজধর্ম্ম যে কি প্রকারে পালন করিতে হয়, দুষ্মন্ত তাহার উত্তম আদর্শ! এই আদর্শ চরিত্র যিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই কবির যশ যে যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছে, সেই কবি যে জগতের কবি, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

কুলপুরোহিত সোমরাত উপস্থিত ছিলেন; তিনিও এই বিষয় ভাবিতেছিলেন। রাজার ধর্ম্মরক্ষা হয় এটি দেখা তাঁহার কর্ত্তব্য। শার্ঙ্গরব কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন—"যদি এরূপ করা যায়?" রাজার মনে একটুকু আশার সঞ্চার হইল; তিনি ঘোরতর সমাস্যায় পড়িয়াছেন—কোন সদুপদেশ পাইতেছেন না। শার্ঙ্গরব কেবল শকুন্তলার দিক দিয়া বলিতেছেন, রাজার অবস্থার বিষয় কিছুই ভাবিতেছেন না। তাই রাজা ব্যগ্র হইয়া নম্রভাবে পুরোহিতকে বলিলেন—"আপনি আমাকে কর্ত্তব্য উপদেশ করুন।" পুরোহিত বলিলেন—"ইনি প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে অবস্থান করুন"।

রাজা। "কেন?"

পুরোহিত। "সাধুজনেরা বলিয়াছেন যে, আপনার প্রথমেই চক্রবর্ত্তী পুত্রের জন্ম হইবে।

যদি সেই মুনিদৌহিত্র চক্রবর্ত্তী লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে ইহাঁকে সাদরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করান যাইবে। ইহার বিপরীতে কিন্তু ইহাঁকে পিতৃকুলে পাঠান হইবে ইহা নিশ্চয়।”

এতক্ষণে একটা মীমাংসা হইল। পুরোহিতকে শত শত ধন্যবাদ—তিনি সময়মত বেশ প্রত্যুৎপন্নমতি দেখাইয়াছেন। রাজা যেন ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া বলিলেন—“যথা গুরুভ্যো রোচতে।” আপনারা গুরুজন—যাহা বলিবেন তাহাই কর্ত্তব্য। পুরোহিত শকুন্তলাকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন।

পাঠক, এবারে একবার শকুন্তলার বিষয় ভাবুন। এই মীমাংসায় রাজা আপাততঃ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু শকুন্তলার কি হইল? তাঁহার মনে কি প্রকারে শান্তি আসিতে পারে? তিনি আজ জগতে কলঙ্কিনী। পিতৃকুল ত্যাগ করিলেন, স্বামী তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। বিচারের অপেক্ষায় তাঁহাকে পুরোহিতের গৃহে বাস করিতে হইবে। এ অবস্থায় কে তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিবে? তিনি একটি ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিবেন। সকলে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিবে—“ঐ ব্যভিচারিণী রাজমহিষী হইবে বলিয়া আসিয়াছিল, এখন পুরোহিতের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতেছে”। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু কি তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল না? কেন ঐ দুষ্মন্তের সমক্ষে বজ্রপাত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল না? এরূপ জীবনের প্রতি পলক যুগ-যুগান্তর বলিয়া বোধ হয়। শকুন্তলার হৃদয়ে তুমুল তুফান বহিতে লাগিল। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এ জগতে আর ক্ষণকালও যেন থাকিতে না হয়, এ মুখ আর কাহাকেও যেন দেখাইতে না হয়, তিনি অনবরত ইহাই কামনা করিতে লাগিলেন। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল—পা চলে না। কণ্ঠরোধ হইতেছে; তিনি অতি কষ্টে বলিলেন—“ভগবতি বসুধে! তোমার ভিতরে আমায় স্থান দেও”।

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দুর্ব্বাসার শাপ হেতু রাজার কোন কথাই মনে পড়িল না। তিনি চিন্তাকুল হইলেন।

হায়! শকুন্তলার কি হইবে। রাজমহিষী রাজদাসীও হইতে পারিলেন না,—পুরোহিতের অন্নদাসী হইলেন। ইহার পর আরও কি হইবে কে জানে? শকুন্তলার দুঃখের আদি-অন্ত নাই। তাঁহার বিপদ-সমুদ্রের কূলকিনারা নাই। তুমুল ঝটিকা, ঘোর ঝঞ্ঝাবাত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কোন দিকে কোন আশা নাই। কে বলিবে যে এই দুর্দ্দিনের অবসান হইবে? কে বলিবে যে এই উত্তালতরঙ্গ জলধি শান্তভাব অবলম্বন করিবে? কে বলিবে যে আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া উজ্জ্বল সূর্য্যের উদয় হইবে? শকুন্তলা এখন আর রাজমহিষী হইতে চান না—সে সকল কামনা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, পার্থিব প্রণয়ের অসারতা অনুভব করিয়া তিনি তাহাকে পদতলে দলিত করিয়াছেন। তিনি এখন কি চান? শান্তি—শান্তি—শান্তি! তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন, এখন মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিতে চান। মনে মনে প্রাণ ভরিয়া তিনি সেই শান্তিময়ী জননীকে ডাকিতেছিলেন। শকুন্তলার কি অপরাধ? কেন তাঁহার প্রতি এ কঠোর বিচার? শাঙ্গর্রব ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন—চঞ্চলতা ভাল নয়। ভগবান্ চঞ্চলতা ভাল বাসেন না। সেই চঞ্চলতার এই প্রায়শ্চিত্ত।

যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। এখন তাঁহাকে শান্তি দেও। কে এ সময় তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে? আমরা পার্থিব বস্তু লইয়া আছি, আমরা সে শান্তির পথ কিরূপে খুঁজিয়া পাইব? কবি পারেন। তাঁহার শরীর পার্থিব হইলেও মন পার্থিব নহে। কবির মন মর্ত্তে বিচরণ করে না। তিনি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। শকুন্তলা একেবারে নিরুপায় হইলেন; তথন তিনি তাঁহার মনপ্রাণ সমস্তই জগন্মাতার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। মাতৃরূপা জগন্মাতা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া নিজক্রোড়ে স্থান দিলেন। এ পালা এইখানেই সাঙ্গ হইল। পাঠক! ভাবিয়া দেখিবেন অল্পাধিক এরূপ ঘটনা অনেকের জীবনে ঘটিয়া থাকে—যখনই আত্মসমর্পণ তখনই উদ্ধার।

সহসা নেপথ্যে “আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য” এই কথা ধ্বনিত হইল।

রাজা শুনিয়া বলিলেন—“কি হইল!”

পুরোহিত আসিয়া বলিলেন—

"দেব! এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে"।

রাজা—কি?

পুরোহিত। "কণ্বশিষ্যেরা চলিয়া গেলেই তাপসবালা আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া ('হা অদৃষ্ট! কি হলো' বলিয়া) কাঁদিতে লাগিল।

রাজা। তার পর।

পুরোহিত। একটি জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রী-আকৃতি আসিয়া তহাকে তুলিয়া আপনার তীর্থের দিকে লইয়া গেল।

রাজা পুরোহিতকে বলিলেন—

"ভগবন! তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, এখন তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কিংবা তাঁহার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। আপনি বিশ্রাম করুন।" রাজা এবার গম্ভীর হইয়াছেন। দুই দিকের দুই তরঙ্গ আসিয়া পরস্পর ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তরঙ্গ নাই—গভীর অতল সমুদ্র! এই অবস্থাটি মনের গতি ফিরিবার অবস্থা। আর এক তরঙ্গ উত্থিত হইয়া অন্যদিকে ধাবিত হইবে তাহারই সূচনা। পুরোহিত রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—রাজার অবস্থা বুঝিলেন, তাই কিছু না বলিয়া "বিজয়স্ব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা বেত্রবতীকে বলিলেন ঃ—

"বেত্রবতী! আমি পর্য্যাকুল হইয়াছি, আমাকে শয়নগৃহে লইয়া যাও।"

বেত্রবতী তাহাই করিল।

যাইতে যাইতে রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"মুনিতনয়াকে প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তাঁহাকে যে বিবাহ করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না সত্য; কিন্তু আমার হৃদয় ইহাতে ব্যথিত হইয়াছে। ব্যথিত হৃদয় আমাকে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছে যে, শকুন্তলা আমার পরিণীতা পত্নী।"

যুক্তি, তর্ক, বিচার একদিকে, হৃদয় একদিকে; হৃদয়ের গতি সকলকে পরাজয় করে। শত যুক্তি শত তর্ক দ্বারা যাহা বুঝা যাইবে না, শুদ্ধ হৃদয়ের একটি ডাকে তাহা বুঝা যায়। তবে ডাক শুনা চাই। অনেক সময় শুনা যায় না, কখন কখন শুনিয়াও শুনি না। যখন আমরা পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ত্তব্যের প্ররোচনায় অভিভূত হই, ঘোর সমস্যায় পতিত হই, তখন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া দেয়—এই তোমার কর্ত্তব্য, ঐ তোমার পথ; ঐ পথে চল—অবাধে চলিয়া যাইতে পারিবে। তখন সব সমস্যা পূর্ণ হইয়া যায়—দুর্দ্দিনের অবসান হয়; তখন আমরা প্রকৃত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হই। কে না ইহা অনুভব করিয়াছেন? অন্তর্যামী সকলের হৃদয়ে থাকিয়া এইরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। এই শক্তির একটি গুরুতর ধাক্কা না পাইয়া কে কবে একটি অসৎ কার্য্যে নিবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন? অসৎ সংকল্প মনে উদয় হওয়া মাত্রই ঐরূপ একটি প্রতিকূল আঘাত অনুভব করা যায়—আমরা তাহা গ্রাহ্য করি না। এই আঘাতই শেষ নয়, অনুতাপানল অনবরত জ্বলিতে থাকে। মানুষকে সৎপথ দেখানই ইহার কায। এ জন্মে না হউক জন্ম-জন্মান্তরেও মানুষকে সৎপথে আনিয়া ঐ শক্তি নিবৃত্ত হয়। মহাকবি কালিদাস এই আধ্যাত্মিক ব্যাপারটি উপরোক্ত বাক্যটিতে সঙ্কেত করিয়াছেন। এরূপ সঙ্কেত তাঁহার আরও অনেক আছে—এই অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকেই আছে। তিনি আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন। অধ্যাত্মরাজ্যের সঙ্গে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

———